ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ।। ১২ পৌষ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

নেপালকে কেন্দ্র করে জাল নোট ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতকে যুদ্ধে হারাতে না পেরে ক্রমাগত জঙ্গিদের ঢুকিয়ে প্রক্সি-ওয়ার চালাচ্ছে দেউলিয়া পাকিস্তান। এখন আবার নেপালকে বেসক্যাম্প করে বিপুল পরিমাণে ভারতীয় জালনোট ছেপে এদেশে ঢোকাচ্ছে এবং তা এক কোটি-দু'কোটি নয়, হাজার লক্ষ কোটি। এক্ষেত্রে পাক, মাও, আল কায়েদা সব একজোট। ইন্ডিয়ান জাল কারেন্সি 'মেড ইন পাকিস্তান'—বন্যার মতো আসছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা ভারতে। সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত এক খবর অনুযায়ী কলকাতা ও আশপাশের শহরতলীতে শতাধিক জালনোট গচ্ছিত রাখার জায়গা বা ব্যাঙ্কার রয়েছে। রয়েছে সেই অনুপাতে এজেন্ট।

কোনও দেশের অর্থনীতিকে যদি পঙ্গু করে দেওয়া যায় তাহলে সেই দেশকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে সুবিধে হয় উন্নত দেশের পক্ষে। সেই কাজটাই করা হচ্ছে ভারতবর্ষে জালনোট ভরিয়ে দিয়ে। আর কাজটা সুকৌশলে করছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। যে কাগজে ভারতের নোট ছাপা হয় সেই একই কাগজে উন্নতমানের জালনোট ছেপে নেপাল-ভারত এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভায়া কলকাতা ভারতের বাজার ছয়লাপ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য আর একটি রুট হলো, নেপাল লাগোয়া বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত।

গত ২৯ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচে ধরা পড়েছিল জাল নোটের কারবারি জাভেদ সিদ্দিকি। তাকে জেরা করে গোয়েন্দারা অনেক চমকপ্রদ তথ্য (এরপর ৪ পাতায়)

স্মরণিকা উন্মোচন ঃ রণজিৎ রায়, (বাঁ দিক থেকে) শ্রীকান্ত যোশী, গোপালকৃষ্ণ রায় এবং ডঃ বিজয় আঢ্য। (খবর ভিতরে)

ভূ-স্বর্গ অগ্নিস্তূপ : কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি বলেছেন, "জম্মু-কাশ্মীরের অবস্থা আগের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। সেই কারণে ওখান থেকে দু'কোম্পানী সেনা (৩০,০০০ সৈন্য) প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের গৃহমন্ত্রক যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিগত ২০ বছরে নিরাপত্তারক্ষীরা সেখান থেকে ৩০,১৪৫টি এ কে রাইফেল উদ্ধার করেছে। এরই পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ১০,৯৮০টি পিস্তল বা গাদা-বন্দুক, ২,১১২টি গ্রেনেড-লঞ্চার, ২১৫টি লাইট মেশিন গান বা এস এল আর; তার সঙ্গে ২৭৪.৩০৩ রাইফেল ও ৩৮৬ স্নিপার রাইফেলও উদ্ধার করেছে রাজ্য পুলিস। দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জম্মু-কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির কথা বলছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, গতবছরের তুলনায় ওই রাজ্যে ২৭২টি জঙ্গি হানার কম ঘটনা ঘটেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৬ সালে ১,৬৬৭টি, ২০০৭ সালে ১০৯২টি, ২০০৮ সালে ৭০৮টি জঙ্গি হানা সংঘটিত হয়েছে। এবছর সেখানে ৪৩৬টি ওইরকম ঘটনা ঘটেছে বলে রাজ্য-পুলিশের একটি সূত্র বলছে। কিন্তু এর সঙ্গে একটি অভিনব তথ্যও উঠে এসেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিস সূত্রে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল—এই ৬ বছরে দৈনিক গড়ে ৬টি করে একে রাইফেল উদ্ধার করেছিল নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু ফারুক আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পুলিশ এখনও অবধি

জঙ্গিদের থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র।

৯০০০ এ কে রাইফেল উদ্ধার করতে পেরেছে। এর অর্থ বছরে গড়ে দেড় হাজার রাইফেল এবং দৈনিক গড়ে ৪টি করে রাইফেল উদ্ধারে সমর্থ হয়েছে ফারুক আবদুল্লার পুলিশ। বিশেষজ্ঞরা কিন্তু মনে করছেন আগের তুলনায় কাশ্মীরে অস্ত্র আমদানি প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে পুলিসি নিষ্ক্রিয়তাও। তাই অস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থ হচ্ছে তারা। আর এজন্য বিশেষজ্ঞরা দায়ী করছেন সন্ত্রাসবাদের প্রতি কংগ্রেস সরকারের নরম মনোভাবকেই।

যার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ২০০২ থেকে ২০০৫, প্রায় আড়াই বছরে মুফতি মহম্মদ সইদের পিডিপি-কংগ্রেস জোট সরকারের আমলে প্রায় ৩৩০০ অস্ত্র উদ্ধার হয়। এরপর জোটধর্ম মেনে মুফতি কংগ্রেসের গুলাম নবী আজাদের হাতে মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দেবার পর তাঁর আমলে অস্ত্র-উদ্ধারের পরিমাণ আরও কমে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আজাদের মুখ্যমন্ত্রীত্বে অস্ত্র উদ্ধার হয় মাত্র ১৭০০টি। যার অর্থ দৈনিক গড়ে প্রায় দু'টি করে অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিস। এটুকু পরিষ্কার যে ১৮ বছরে দৈনিক হিসাবেও অস্ত্র উদ্ধারের পরিমাণ ব্যাপক হারে কমেছে। এবং কমতে কমতে ৯০-এর গোড়াতে সেখানে দৈনিক গড়ে ৬টি করে অস্ত্র উদ্ধার হোত, সেখানে ২০০৮-এ তা এসে দাঁড়িয়েছে দৈনিক গড়ে মাত্র দু'টি অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে। চলতি বছরে নিরাপত্তাবাহিনী ২৫০টি একে রাইফেল উদ্ধার করেছে। যার অর্থ গড়ে তিনদিনে দু'টো করে রাইফেল উদ্ধার হয়েছে।

গত চার বছরে জম্মু-কাশ্মীরে গ্রেনেড আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে—২০০৬-এ ২২৬ বার, ২০০৭-এ ১০৭ বার, ২০০৮-এ ৭৬ বার, ২০০৯-এ ৩০শে অক্টোবর অবধি ৪৯ বার। আই ই ডি-(ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণও অনুরূপে ২০০৬-এ ৮৩ বার, ২০০৭-এ ৫৬ বার, ২০০৮-এ ৩১ বার, ২০০৯-এ ১৭ বার সংঘটিত হয়েছে। একতরফা গুলি চালানোর ঘটনা ২০০৬-এ ৩৮৬টি, ২০০৭-এ ২০৩ টি, ২০০৮-এ ৮৬টি এবং ২০০৯-এ ৬৫টি ঘটেছে। অন্যদিকে, গুলি-বিনিময়ের ঘটনা গত চার বছরে ২০০৬-এ ৫৩৬ বার, ২০০৭-এ ৪০৭ বার, ২০০৮-এ ৫৪ বার এবং এ-বছরে এখনও পর্যন্ত ১৫৯ বার সংঘটিত হয়েছে।

ইংরেজী নববর্ষের প্রাক্কালে জম্মু-কাশ্মীর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০,০০০ সেনা-প্রত্যাহার এবং আরও সেনা-প্রত্যাহারের আশ্বাস আতঙ্কের পূর্বস্মৃতি ফিরিয়ে আনবে না তো ভূ-স্বর্গে?

নেতাজী ইণ্ডোরে শ্রীহরি সৎসঙ্গের হনুমন্ত কথা। ইনসেটে কথাকার ভূপেন্দ্র পাণ্ড্যা। (খবর ভিতরে)

হত্যা-রক্ত-সন্ত্রাস

যৌথবাহিনী যেন দুঃস্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। লালগড়ে একপ্রকার বাধ্য হয়েই যৌথবাহিনী পাঠিয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশাসন। তবে এই নিধিরামদের ঢাল-তলোয়ারের কমতি নেই। খামতি নেই জনগণের অঢেল অর্থ ব্যয়ে। স্বরাষ্ট্রসচিবের বয়ান অনুযায়ী রোজ খরচ হয় ৩৫ লক্ষ টাকার বেশি। কিন্তু এতে না এসেছে শান্তি, না রয়েছে প্রশাসনের সত্যিকারের অস্তিত্ব। যৌথবাহিনীর অত্যাচার আবার-আমজনতার কাছে দুঃস্বপ্ন। আজনাগুলির বনমালী মাহাত ও করমসোলের সুনীল মাহাতরা রেহাই পায়নি। প্রকাশ্য দিবালোকে ভিডিও ক্যামেরার সামনে গোহমীডাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্রী বা ঝাড়গ্রামে, পীড়াকাটায় বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী নিরস্ত্র মহিলাদের ব্যাপক লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। ফল অবশ্য ফলেছে হাতে নাতে। মন থেকে না চাইলেও বাস্তবের রুক্ষ জমিতে দাঁড়িয়ে ভিলেন মাওবাদীদেরই বরণ করছে আম-জনতা। শাসকদলের দাস হয়ে থাকার থেকে মাথা তুলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চায় সবাই। দিনে দিনে বেড়েছে মাওবাদীদের জনপ্রিয়তার গ্রাফ্। আর সশস্ত্র, নিরস্ত্র যে দুইশতাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে সত্যিকার মাওবাদী কজন তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর সন্দেহ। ও সি অতীন দত্ত'র মুক্তির বিনিময়ে যাদেরকে মুক্তি দিয়েছিল আদালত তারা যে মাওবাদী ছিলেন না সেটা শাসক দলের সর্বোচ্চ নেতা থেকে প্রশাসন—সবাই স্বীকার করে নিয়েছিল।

রক্তাক্ত লালগড়

নকশালপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠীর একীকৃত দল 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া (মাওইস্ট)' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে তারা ২০৬০-এ দিল্লী-তথা ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা ধার্য করেছে। তবে যৌথবাহিনী নামিয়ে লালগড়ের 'গড়' যে বুদ্ধবাবু-প্রণববাবু ও চিদাম্বরম্ সাহেবরা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

যৌথবাহিনী বহাল হওয়ার পর অতি লাল কমরেডদের হাতে ফিকে লাল কমরেডদের নিয়মিতভাবে নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। ২০০৪-থেকেই মাওবাদী কমরেডদের হাতে বুদ্ধ বিমানপন্থী কমরেডদের নৃশংস হত্যা শুরু হয়েছিল জঙ্গলমহলে। তারপর শুধুই হত্যা, রক্ত আর সন্ত্রাস।

এপ্রসঙ্গে দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খোদ লালগড় থানা থেকে সামান্য দূরত্বে সিপিএম-এর দলীয় কার্যালয় জনগণের কমিটির লোকেরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল গত জুন মাসের ১৬ তারিখে। পুলিশ ধারে-পাশে যায়নি। লালগড় ভারতবর্ষে একমাত্র জায়গা যেখানে ঝাড়খণ্ড পার্টি নির্বাচনে জিতে পঞ্চায়েৎ সমিতি (Block level) (এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

হিন্দুস্থান সমাচারের সাংবাদিকতা কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'ফ্যাক্টস্ আর সেক্রেড, কমেন্টস্ আর ফ্রি'। সাংবাদিকতার এই আপ্তবাক্যটি বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর কলকাতা শাখার সারাদিনব্যাপী কর্মশালায় আবারও কর্মরত সাংবাদিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ সাংবাদিক (আনন্দবাজার) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। এদিন কর্মশালার সূত্রপাত করেন আর এক প্রবীণ সাংবাদিক (দ্য স্টেটসম্যান ও দ্য টেলিগ্রাফ) এবং হিন্দুস্থান সমাচারের কলকাতা শাখার প্রধান রণজিৎ রায়।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে দু'দশক আগে এবং বর্তমান সময়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। ইউ এন আই-এর প্রবীণ সাংবাদিক গোপালকৃষ্ণ রায় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কত সাধারণ জায়গা থেকে অসাধারণ 'এক্সক্লুসিভ' সংবাদ কীভাবে সংগৃহীত হয় তা ব্যাখ্যা করেন। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে একদিন তিনি কিভাবে নিজেই সংবাদ হয়ে গেলেন, সে প্রসঙ্গও উঠে এল তাঁর সরস বর্ণনায় গত ২০ ডিসেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত কর্মশালায়।

কর্মশালার মূল বিষয়ই ছিল—'সংবাদ সংগ্রহের কলাকৌশল'। শ্রীরায়ের কথায় দ্রুত পরিবেশনের ফলেই সাধারণ সংবাদ অসাধারণ ও 'এক্সক্লুসিভ' হয়ে ওঠে। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরায় বলেন, 'শুধু গুজরাটেই দাঙ্গা হয়'—এভাবে সংবাদ পরিবেশন নিহিত স্বার্থ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিশিষ্ট সাংবাদিক অম্বরীশ মুখার্জী কীরকম ধৈর্য সহকারে এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আড্ডা দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় তা বর্ণনা করেন। আর এক প্রবীণ সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক মুকুল গুহ সমসাময়িক সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। ভুবনেশ্বরের হিন্দুস্থান সমাচারের ভারপ্রাপ্ত সঞ্জয় জেনা সংবাদ লেখার সময় যে সব দিক লক্ষ্য রাখতে হয় তা ব্যাখ্যা করেন। আলোচনার মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তরও হয়। উপস্থিত সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা পাঠরতদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মঞ্চ স্থ সকলেই ভাগাভাগি করে। সব মিলিয়ে হিন্দুস্থান সমাচারের এই প্রয়াস প্রায় একশ ভাগ সফল, তা বলা যেতেই পারে। এমনকী রণজিৎবাবু পাঠরতদের হিন্দুস্থান সমাচারে এসে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণেরও আহ্বান জানান।

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য হিন্দুস্থান সমাচারের (কলকাতা) বার্ষিক স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। কর্মশালায় পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন হিন্দুস্থান সমাচারের প্রধান মার্গদর্শক শ্রীকান্ত যোশী।

সব মিলিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা প্রায় শতাধিক ছিল। এই কর্মশালায় যোগ দিয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছে বলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কর্মশালায় যোগদানকারী ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করেন শ্রীকান্ত যোশী।

রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় কে এল ও জঙ্গিরা জোট বাধছে

প্রাণপ্রতিম পাল ঃ আলিপুরদুয়ার ॥ ফের জোটবদ্ধ হতে শুরু করলেন আত্মসমর্পণকারী কে এল ও জঙ্গি ও লিঙ্কম্যানরা। অসম-বাংলা সীমান্তে এদের গতিবিধি নজরে এসেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বেশ কয়েকদিন আগে আলিপুরদুয়ার মহকুমার কুমারগ্রামদুয়ার ব্লকে আত্মসমর্পণকারী কে এল ও জঙ্গিরা একটি সভা করে। সভা অনুষ্ঠিত হয় চেংমারী গ্রামের গাইনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। ওই সভায় কে এল ও জঙ্গিরা ১২ জনের একটি টিম তৈরি করে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ২০০১ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকজন কে এল ও জঙ্গি ও লিঙ্কম্যান আত্মসমর্পণ করেছিল। তখন রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আত্মসমর্পণকারীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। তাদের ওপর চলা সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার রাখেনি বলে অভিযোগ করেন নতুন টিমের (কমিটির) সহ-সভাপতি মারঘুম খাড়িয়া। একটি সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণকারী এইসব কে এল ও-জঙ্গি ও লিঙ্কম্যানদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের আবারও দেশবিরোধী কাজে লাগাতে চাইছে বেশ কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। তবে সংস্থার পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষে নতুন সভাপতি পেলে দাস বলেন, আত্মসমর্পণকারী কে এল ও-জঙ্গি ও লিঙ্কম্যানদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন দিতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তাই, আমরা জোটবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। তবে জেলাশাসক ও মানবাধিকার কমিশনের কাছে তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় নিয়ে সরব হবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক ধীরেন রায়।

এই সময়

অরণ্যে রোদন

মাও-হামলা অনেক সন্তানহারা মা কিংবা স্বামী হারানো স্ত্রী-র রোদনের কারণ হয়েছে। কিন্তু মাওবাদী নামধারীরা যে অরণ্যকে তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল সেই অরণ্যের সন্তানদেরই কান্না শোনা গেল ঝাড়গ্রাম ডিয়ার পার্কে। কারণ গত ১৯ ডিসেম্বর ওখানে আগুন লাগায় মাওবাদীরা। ৮০ একর বিস্তৃত ওই পার্কে হরিণ ছাড়াও থাকত পাইথন, ভালুক, বাঁদর, সাপ, ঘড়িয়াল, শেয়াল ও শজারু। এদের জন্যে আর অরণ্যে রোদন করে কি হবে? মাওদের কানে সেই আওয়াজ পৌঁছবে কি?

প্রবাসে দৈবের বশে

কাজের সন্ধানে এক শিখ যুবক স্নাতক উত্তীর্ণ হবার পর রওনা দেন টেক্সাসের পথে। সেখানে একটি দোকানে পিৎজা (এক ধরনের ইতালীয় খাবার) পরিবেশনের কাজে নিয়োজিত হন তিনি। কিছুদিন আগে একটা বাড়িতে পিৎজা দিতে গেলে ওই বাড়ির জনা চারেক ব্যক্তি শিখ যুবকটিকে লাদেনের বংশধর ভেবে কোনও পয়সা-কড়ি না দিয়েই তাকে টিটকিরি দিতে থাকে। যুবকটি প্রতিবাদ করলে তাকে একটি সুইমিং পুলে ফেলে বেধড়ক মারধর করে ওই চারজন। স্থানীয় পুলিশকে এব্যাপারে একদম প্রথমে জানানো হলেও তারা ঠিক-ঠাক সাড়া দেয়নি বলে মার্কিন শিখ সমাজের অভিযোগ। প্রবাসে দৈবের বশে একী দুর্ভোগ ভাবুন তো!

এস্টেট গড়তে সংশোধনী

গত ২১শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্ধ কারখানা, চা-বাগান এবং মিলের জমিতে রিয়েল এস্টেট গড়ে তোলা সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করিয়েছে। বিল না বলে এটাকে সংশোধনী বিল বলাই যুক্তি সম্মত হবে। ১৯৫৩ সালের এস্টেট অধিগ্রহণ আইন অনুসারে কোনও চালু ফ্যাক্টরি বা মিল এবং কোনও রুগ্ন ফ্যাক্টরি বা মিলের জমিতে উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যে রাজ্যে ৪১ হাজার একর জমি পতিত হয়েছে স্রেফ বন্ধ কারখানার দরুণ সেই রাজ্যে এমন আইন আর যাই হোক শোভা পায় না। তাই বলে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা? মমতাদেবী আন্দোলনে কবে যে নামবেন!

টি আর পি এবং মীরা কুমার

হুঁ হুঁ বাবা, একেই বলেই টি আর পি (টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট)। এর দ্বারাই বোঝা যায় কোন টিভি চ্যানেলের কেমন জনপ্রিয়তা। এই মুহূর্তে লোকসভা টিভির টি আর পি আর বলতে হয়! কারণ ঝাড়-পিট আর অ্যাকশন থ্রিলারের ছবি দেখতে ভালোলাগা জনতার যাবতীয় বিনোদন এখন হাজির লোকসভায় সাংসদদের চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি আর হাতাহাতির মধ্যে। যার লাইভ এবং এক্সক্লুসিভ সম্প্রচার সরাসরি দেখা যায় লোকসভা টিভিতে। আর এতেই লোকসভার স্পীকার মীরা কুমার গেলেন ক্ষেপে। লোকসভা টিভির সম্প্রচারকদের বললেন—"ব্যাড বয়েজ, ইওর ফিফটিন মিনিটস আর ওভার"। পনেরো মিনিটে কি আর পাবলিকের মন ভরে!

হাবিলদার খুন

তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলার ওয়েলিংটনে ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ-এ গত ১৯ ডিসেম্বর এক হাবিলদারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এমনিতে ওই এলাকাটি উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে অবস্থিত। পুলিশের অনুমান যেহেতু ক্যাম্পাসের ভেতরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ তাই ভেতরের কেউই এহেন কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। প্রায় দেড়শ বছর পরে পুনর্বার সংঘটিত এই মর্মান্তিক ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই যে মিলিটারী মহলে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য।

ইওরস সিনসিয়ারলি

বই-এর নাম ইওরস সিনসিয়ারলি। লেখক গান্ধী-নেহেরু পরিবারের একান্ত অনুগত নটবর সিং। ছেলের দুর্নীতির দায়ে যাঁকে বিদেশ-মন্ত্রকের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল। বইটির প্রচ্ছদ নামেই মালুম হয়। ইন্দিরার প্রতি নটবরের 'অকৃত্রিম শ্রদ্ধা' বইতে প্রকাশ পেয়েছে। এর মাঝেই চীনের আশা-নিরাশা নিয়ে উদ্বিগ্ন ইন্দিরার অন্যরকম পরিচয়ও পেতে পারেন পাঠক। ইন্দিরা-স্তুতির মধ্যে জরুরি অবস্থার কদর্য রূপটাও অজান্তেই চলে এসেছে নটবরের লেখায়। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, ইন্দিরাকে নিয়ে তাঁর বই-তে হাজারও কথা থাকলেও সোনিয়াকে এড়িয়েই গিয়েছেন নটবর। তিনি এবার একবারে ঘাড়ধাক্কা খেলেন বলে।

অধিকার ও কর্তব্য

সংবিধান প্রণেতারা এতদিন পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন যে ভোটদান নাকি প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকার। কিন্তু 'অন্যরকম' মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শেখাচ্ছেন ভোটদান আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। সেই কারণে গুজরাতের পুরসভা, পঞ্চায়েত ও জেলা তালুকের নির্বাচনে ভোটদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকী ভোট দিতে না গেলে ও তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে ব্যবস্থা নেবার কথাও বলা হয়েছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটির সুপারিশ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা

নিজেদের সুবিধামতো সময়েই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার সেলফ হইতে নামাইয়া রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া দিলেন। যদিও বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্রর নেতৃত্বে গঠিত 'ন্যাশনাল কমিশন অন রিলিজিয়াস লিঙ্গুয়িস্টিক মাইনোরিটিস'-এর রিপোর্ট আড়াই বছর আগে ২০০৭-এর ২২মে সরকারের কাছে পেশ করিয়াছিলেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি পদে নিয়োগে সংখ্যালঘুদের জন্য ১৫ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি। সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী সলমন খুরশিদ ১৮ ডিসেম্বর লোকসভায় এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে যে ১৫ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহাতে মুসলিমদের জন্য ১০ এবং অন্য সংখ্যালঘুদের জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। পাশাপাশি সকল ধর্মাবলম্বী দলিতদের তপসিলি জাতিভুক্ত করিবার সুপারিশও করা হইয়াছে।

এই কমিটির রিপোর্টে ১৯৫০ সালের তফসিলি জাতি আইনটি সংশোধনের আর্জি জানানো হইয়াছে। উল্লেখ্য, ওই আইনে মুসলিমসহ সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তফসিলি তালিকার বাহিরে রাখা হইয়াছিল। এইবার সেই তালিকার সংরক্ষণের আওতাতেও যাহাতে তাহারা অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, সেই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য দিতে বলা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, এই ১৫ শতাংশ সংরক্ষিত পদে কোনও ভাবে যাতে সংখ্যাগুরুদের (পড়ুন হিন্দুদের) নিয়োগ না করা হয়, সরকারকে তাহা নিশ্চি ত করিতে বলা হইয়াছে।

লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহারে কর্মক্ষেত্রে মুসলিমদের সংরক্ষণের জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। তাই রঙ্গনাথ কমিশনের সুপারিশ স্বীকার করিয়া লইলে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু জনভিত্তি যে আরও দৃঢ় হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর এই একই লক্ষ্যে মুলায়ম, মায়াবতী, লালুপ্রসাদের মতো নেতারাও এখন এই রিপোর্টটিকে স্বাগত জানাইতে শুরু করিয়াছেন। এমনকী একই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চি মবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল পদে বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচারের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাচার পশ্চি মবঙ্গের বামপন্থী শাসকদের কাছে খুব একটা গ্রহণীয় নন। কেননা তিনি তাঁহার রিপোর্টে এই দেশের মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থানের নিরীখে পশ্চি মবঙ্গের কড়া সমালোচনা করিয়াছেন। সাচার যদি সত্যই রাজ্যপাল হইয়া আসেন তাহা হইলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম যে চাপে থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। কেননা, রাজনৈতিক কারণেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা তাহাদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের মন জয়ে মমতার প্রচেষ্টা আরও সাফল্যের মুখ দেখিবে।

ইতিপূর্বে এই সম্পাদকীয় কলমে বলা হইয়াছে যে এই সময় তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টায় স্বীকৃতি কংগ্রেসের কূট চাল। তেলেঙ্গানার সমস্ত মানুষই তেলেঙ্গানাপন্থী টি আর এস ভক্ত নয়। সংসদ ও বিধানসভায় টি আর এস-পন্থীদের নগণ্য উপস্থিতিই ইহার প্রমাণ। আসলে মুসলিম তোষণে বহু ঐতিহ্যের অধিকারী কংগ্রেস নিজাম শাসিত হায়দরাবাদকে পুনরায় স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা দিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী। কংগ্রেস যেমন চিরকালই তাহাদের আজ্ঞাবহদের দ্বারা গঠিত কমিশন, কমিটি প্রভৃতির রিপোর্ট সময়মতো ছাড়িবার জন্য ফাইল বন্দী করিয়া রাখে, এই রিপোর্টেও সেইভাবে রাখা হইয়াছিল। নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার মুসলিম ভোট যাহাতে অটুট থাকে, সেই কারণেই এই সময় এই রিপোর্ট প্রকাশ। চাকরি ও শিক্ষায় সংরক্ষণ লইয়া বিতর্ক এই দেশে বারে বারে রক্তক্ষয়ী আকার ধারণ করিয়াছে। দেশ জুড়িয়া তাই আবার একবার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টির আশঙ্কা রহিয়া গেল।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর গভীরতম আবেগের কেন্দ্র...ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হোত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রতিধ্বনিত হোত তাঁর ধমনীতে; ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশীথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ—রক্তে-মাংসে গড়া ভারতপ্রতিমা...ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তার পবিত্রতা, তার প্রজ্ঞা, তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ—সবকিছুর তিনি ছিলেন প্রতীক পুরুষ।

—ভগিনী নিবেদিতা

সূত্র আমার ভারত অমর ভারত (বিবেকানন্দের বাণীর সংকলন)

মার্কিন কংগ্রেসের কাছে ভারতীয় কংগ্রেসের শুধুই আত্মসমর্পণ

এন সি দে

ডিসেম্বর ২০০৯! বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকারী দু-দুটি সম্মেলন। একটি জেনিভায়। ডব্লু. টি. ও অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রি-পরিষদীয় সম্মেলন। শেষ হয়েছে ২রা ডিসেম্বর। আর একটি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ। বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন। ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে, চলেছে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। ডব্লু. টি. ও সম্মেলনে অচলাবস্থা শুরু হয়েছে দোহা সম্মেলন থেকে। সেই অচলাবস্থা কাটেনি। বিশ্ব পরিবেশ দূষণ রুখতে ১৯২টি দেশ ব্রাজিলের রিওডি-জেনেরো শহরে গড়ে তুলেছিল United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)। এদের বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়েছে ১৯৯৫ সাল থেকে। নাম দেওয়া হয়েছে Conference of Parties 1, 2 ইত্যাদি। কোপেনহেগেনের কমনওয়েল্‌থ্‌ সম্মেলনে বলে দিয়েছেন যে ভারত পরিবেশ দূষণ কমাতে এবং উষ্ণতা সীমার মধ্যে রাখতে যে কোনও লক্ষ্যমাত্রায় রাজি যদি তা সমান দায়িত্ব বন্টনের ভিত্তিতে হয়। এর কয়েকদিন বাদেই কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ লোকসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে ২০০৫-কে ভিত্তি বর্ষ ধরে ২০২০-র মধ্যে 'কার্বন এমি সন ইনটেনসিটি' (CEE) অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণের তীব্রতার হার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনবে ভারত। চীনই প্রথম নিজের থেকে এই ঘোষণা করে ভারতকে বিপথগামী করেছে।

চীন ও ভারতের এই স্বেচ্ছা-ঘোষণা আমেরিকার শয়তানিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। কিন্তু এই ভিত্তি বর্ষ আরও আগে থেকে, নিদেনপক্ষে ১৯৯০ থেকে ধরা হলো না কেন? আসলে চীন ও আমেরিকা—এই দুটি দেশেই শিল্পায়ন ঘটেছে অনেক আগেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই দেশেই দূষণের মাত্রা অনেক আগে থেকেই ভারতের থেকে অনেক বেশী। উন্নয়ন ঘটাতে গেলেই শিল্পায়ন জরুরি। শিল্পায়ন হলেই কার্বন নিঃসরণের হার বাড়বেই। আর কার্বন নিঃসরণের হার কম রাখতে গেলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যা প্রচুর ব্যয়সাধ্য বলেই কিয়োটো সম্মেলনে এই দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল উন্নত দেশগুলোর উপর। কিন্তু উন্নত দেশগুলো এখন বেঁকে বসেছে। তারা বায়ু দূষণ রোধের নামে নয়া ব্যবসার গন্ধ পেয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রপ্তানী করে বিশ্ব বাণিজ্যে দাদাগিরি চালু রাখার ধান্দায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরির বিরোধিতা শুরু করেছে। দেশে দেশে আণবিক বিদ্যুৎ তৈরীর প্রস্তুতি শুরু করেছে। দেশে দেশে আণবিক বিদ্যুৎ চুল্লী সরবরাহের চুক্তি করছে। ভারতের সঙ্গেও করেছে। বিদ্যুৎ তৈরী করতে গিয়েই নাকি আমরা কয়লা বেশী ব্যবহার করছি আর তাতেই আমরা বেশী দূষণ করছি।

এবার দেখা যাক ভারতের তুলনায় চীন এবং উন্নত দেশগুলোতে কয়লার ব্যবহার কতটা হচ্ছে। বায়ু দূষণই বা তারা কতটা করছে। Energy Information Administration (EIA) আমেরিকাররই একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। তাদের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭-এ বিশ্বের মোট কয়লা ব্যবহারের মাত্র ৮.৩ শতাংশ ব্যবহার করেছিল ভারত; সেখানে আমেরিকা ও চীন ব্যবহার করেছিল যথাক্রমে ১৫.৯ ও ৩৯.২ শতাংশ। ভারতের পরিমাণ সেখানে মাত্রই ১৪.২ ত্মচবহু। সুতরাং আমেরিকার উচিৎ ভারতকে বেশি কয়লা ব্যবহারে দায়ী না করে নিজের চরকায় আগে তেল দেওয়া।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তাই কুমতলবেই আমেরিকা দাবী তুলেছে ভারতের কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপর কয়লা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। ২০৩০ সালের মধ্যে ৮ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির যে পরিকল্পনা ভারত গ্রহণ করেছে তার অর্ধেকের বেশী হবে কয়লার সাহায্যে। কারণ ভারতের রয়েছে ২৫০ বিলিয়ন টনের চেয়েও বেশি মজুত কয়লা। এই মজুত ছেড়ে আমরা আমেরিকার কাছ থেকে দূষণহীন জ্বালানি কিনি এটাই তারা চায়। সেই কারণে কোপেনহেগেনে দূষণহীন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নশীল অনুন্নত দেশগুলোকে বিনে পয়সায় দিতে আমেরিকা রাজি হচ্ছে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশগুলিতেই বায়ু দূষণ সবচেয়ে বেশী। অথচ বায়ু দূষণের দায় তারা অনুন্নত দেশগুলির উপরেই চাপিয়ে দিতে চাইছে। বলা যায় বায়ু দূষণের নামে তারা তাদের নতুন নতুন ব্যবসাও ফেঁদেছে।

> **"ভারতের রয়েছে ২৫০ বিলিয়ন টনের চেয়েও বেশি মজুত কয়লা। এই মজুত ছেড়ে আমরা আমেরিকার কাছ থেকে দূষণহীন জ্বালানি কিনি এটাই তারা চায়। সেই কারণে কোপেনহেগেনে দূষণহীন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নশীল অনুন্নত দেশগুলোকে বিনে পয়সায় দিতে আমেরিকা রাজি হচ্ছে না।"**

এবারের সম্মেলনটি ১৫তম— ট্রথত্ন ১৫। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনটি হয় জাপানের কিয়োটো শহরে ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে। এখানেই গৃহীত হয় আজকের মহাবিতর্কিত প্রস্তাবগুলি। এটিই কিয়েটো প্রোটোকল নামে খ্যাত। এই প্রোটোকলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে শিল্পোন্নত দেশগুলি যেহেতু বেশী পরিমাণে পরিবেশ দূষণ করে তাই তাদেরই দূষণের মাত্রা মাথা পিছু হারে বেশী করে কমাতে হবে এবং উন্নয়নশীল গরীব দেশগুলোকে এই ব্যাপারে অর্থ সাহায্য ও পরিবেশ রক্ষা-সহায়ক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করতে হবে। কিয়োটো প্রটোকল এখনও সিদ্ধান্ত স্তরেই রয়ে গেছে। ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত উন্নত দেশগুলো তাদের বার্ষিক বায়ু দূষণের পরিমাণ বাড়িয়েছে ২.২ জিগাটনের বেশী। ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিযার বালি সম্মেলনে স্থির হয় কিয়োটো প্রোটোকলের পরিণতির উপর দাঁড়িয়ে বিশ্ব পরিবেশ নীতি রূপায়ণ করা হবে কোপেনহেগেনে।

আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ধনী দেশগুলোর একগুঁয়েমি ও সদিচ্ছার অভাবে কোপেনহেগেন সম্মেলনেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও দূষণ কমাতে এই সম্মেলনেও কোনও কার্যকরী বিশ্ব পরিবেশ নীতি গ্রহণ অধরাই থেকে গেছে। যেমনটি হয়েছে ডব্লু. টি. ও'-র জেনিভার সম্মেলনে।

কেন এই অচলাবস্থা? উন্নত দেশগুলি চাইছে পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেক দেশের দায়িত্বই সমান হোক। তারা তাই 'সিঙ্গল লিগাল ইনস্ট্রুমেন্ট' অর্থাৎ 'একই আইনগত দায়বদ্ধ তা'-র কথাটি এই প্রোটোকলে ঢোকানো হোক। এই নিয়েই সমস্যা। আমেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর এই আব্দারে ঘি ঢেলে দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংজী। তিনি নভেম্বর '০৯-এর শেষের দিকে ত্রিনিদাদে যেমন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন গরীব দেশে আমাদের দেশের মতই ১৫ বছরের বেশী পুরনো যাত্রীবাহী গাড়ী বাজেয়াপ্ত করায়, নতুন গাড়ী কিনতে বাধ্য করায়, গাড়ী বিক্রেতাদের গাড়ী বিক্রি এক ধাক্কায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গাড়ী কেনার জন্য সরকার ঋণ দিয়েছে ক্রেতাদের আর অর্থ এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ থেকে। কয়লার ব্যবহার বন্ধ করে পরমাণু চুল্লী বিক্রি করতে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি করেছে। এসবই হচ্ছে পরিবেশ দূষণমুক্ত করার নামে নয়া ব্যবসা চালু করার দাদার কীর্তি।

উল্টে আমেরিকা বলতে শুরু করেছে যে সমস্ত দেশ স্বেচ্ছা ঘোষণা করেছে তাদের আইনগতভাবে বাধ্য করার জন্য 'Single Legal Instrument' গঠন হোক। অর্থাৎ পরিবেশ রক্ষার প্রতিশ্রুতি ঠিকঠাক মেনে চলছে কিনা তা দেখার জন্য 'নজরদারি' ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক, অর্থাৎ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের দোহাই দিয়ে যেমন ইরাক, আফগানিস্থানে নজরদারির নামে দুই দেশকে কার্যত দখল করে নিয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপ। ইরান, উত্তর কোরিয়াকে হুংকার দিয়ে চলেছে। এসবই করছে ওদের দালাল ইউ. এন. ও'-র আইনগত ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়েই।

বিশেষজ্ঞগণ বলছেন ভারত এখন উঠতি অর্থনীতির (Emerging Economy) দেশ। এই অবস্থায় ভারতের উচিৎ নয় অন্তত ২০২০-২৫ সাল পর্যন্ত দূষণ কমানোর আইনগত চুক্তিতে যাওয়া, কারণ তাতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হবে। ভারত কেবল তার ভোগকে (কনজিওমারিজম) সীমিত রেখে বায়ুমণ্ডল পরিবেশকে রক্ষা করার কর্তব্য পালন করবে। এটাই তার যুগ যুগের শিক্ষা। উপনিষদের শিক্ষা ঃ 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা' (ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ) অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই শুধু ভোগ।

সাবাস দারদা !

ইন্দ্রমোহন উপাধ্যায়

বালুচিস্তানের ভূত আর পিছু ছাড়ছে না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর। গত জুলাইয়ে মিশরের শর্ম-এল-শেখ-এ বসে পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে সই করে যে 'ব্লান্ডার'-টি মনমোহন সিং করেছিলেন, তার মাশুল আজ আমাদের পদে পদে গুণতে হচ্ছে। পাকিস্তানের বালুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ভারত মদত জোগাচ্ছে বলে পাক প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগকে কার্যত তিনি মেনে নিয়েছিলেন ওই বিবৃতিতে। সন্ত্রাসে মদতদার হিসাবে নিজের দেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে মনমোহন সেদিন শর্ম-এল-শেখ-এ ভারতের মাথাকে সত্যিই সরমে হেঁট করে দিয়েছিলেন। জোট নিরপেক্ষ বৈঠকের অবকাশে গিলানির সঙ্গে 'একান্ত' কথাবার্তায় তিনি নাকি এমনই 'আবেগপ্রবণ' হয়ে যান যে, যৌথ বিবৃতিতে লিখে দেন, ২৬/১১-র মুম্বই কাণ্ডের পর 'সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াকে দু'দেশের মধ্যে সার্বিক আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত হবে না এবং এই দু'টি বিষয়কে এক বন্ধনীর মধ্যে রাখা উচিত নয়।' অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কী ব্যবস্থা নিচ্ছে বা আদৌ নিচ্ছে কিনা তার কথা ভেবে অন্যান্য বিষয় নিয়ে দু'দেশের মধ্যে সার্বিক আলোচনা থেমে থাকবে না। ওই বিবৃতি দিয়ে মুম্বই বিস্ফোরণ পরবর্তী ভারতের অবস্থান থেকে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছিলেন মনমোহন। আরও মারাত্মক হল, ওই বিবৃতিতে বালুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ভারতের হাত আছে বলে পাকিস্তানের অভিযোগের উল্লেখ আছে, আর তাতেই 'উদার' মনমোহন সই করে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি।

এমন একটা অস্ত্র হাতে পেয়ে পাকিস্তান ছেড়ে দেবে? ভারতের গায়ে সন্ত্রাসবাদে মদতদাতার লেবেল এঁটে দেওয়ার কূটনৈতিক সাফল্যের জোরে এখন ছুতোয়-নাতায় দিল্লিকে জড়িয়ে দিতে সে তৎপর। তাই তার অভিযোগ এখন আর বালুচিস্তানে সীমিত থাকছে না, পাক-ভূমিতে যেখানে যা বিস্ফোরণ বা কোনরকম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটছে তার পিছনে ভারতের হাত খুঁজছে সে। সেখানে ভারতের যুক্তি বলতে একটাই—আরে, অভিযোগ তো এমন হাজরাটা তোলা যায়, কিন্তু ওরা কিস্‌সু প্রমাণ করতে পারবে না। হয়ত পারবে না, কিন্তু তাই বলে বেয়াড়া প্রতিবেশীর অভিযোগকে এমন সইসাবুদ করে পাত্তা দিতে হবে?

বিরোধীদের মধ্যে তো বটেই, কংগ্রেসের ভিতরেও এই 'মনমোহনী ব্লান্ডারে' অসন্তোষ কম ছিল না। গণতান্ত্রিক (!) হলেও কংগ্রেস দলটা স্বাধীনতা ইস্তক রাজতন্ত্রেরই অনুসারী। আর রাজবংশ তো সেই একমেবাদ্বিতীয়ম নেহরু-গান্ধী পরিবার। অতএব সোনিয়া গান্ধী, নিদেনপক্ষে রাহুলের মুখ থেকে যদি কোনও সমালোচনাসূচক মন্তব্য না বেরোয় তাহলে দলে কার সাধ্য এ নিয়ে মুখ খোলে। 'হাতের পুতুল' মনমোহন অতীতের অনেক অপকর্মের মতো আর একটা বড় রকমের অপকর্ম না হয় করেই ফেলেছেন, তাই বলে সোনিয়া-রাহুল তাঁকে অপদস্থ করতে চাইবেন? না, তা হতে পারে না। সে যাত্রায় তাই একটা ড্যামেজ কন্ট্রোলও করে ফেলা গিয়েছিল। যে-সব কংগ্রেসীর মুখ ফুটে দু' একটা কথা বেরিয়েও এসেছিল, তাঁরা শেষ পর্যন্ত থুথু গিলেছিলেন। বিরোধী পক্ষ সংসদে হৈ চৈ জুড়েও ট্রেজারি বেঞ্চে কোনও তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেনি।

বিজয় দারদা

ছাই চাপা দিলেও দলের একাংশের মধ্যে সেদিনের সেই আগুনকে সোনিয়া-মনমোহন-প্রণবরা যে একেবারে নিভিয়ে দিতে পারেনি, সেটা হঠাৎই প্রকাশ হয়ে গেল কয়েকদিন আগে সংসদ অধিবেশন চলাকালেই। বিরোধীপক্ষের কেউ নয়, কংগ্রেসেরই এক সাংসদ এমন একটা প্রশ্ন করে বসলেন যে, তার জবাব দিতে গিয়ে বিদেশী মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণেরই এক গাল মাছি। কংগ্রেসের ওই সাংসদের নাম বিজয় জওহরলাল দারদা। সরকারের কাছে তাঁর প্রশ্নটি ছিল—আচ্ছা শর্ম-এল-শেখ-এ বিবৃতির খসড়া করার সময় বালুচিস্তান প্রসঙ্গ টি কি ভুল করে ঢুকে গিয়েছিল? নিজেদের দলেরই এক এম পি-র মুখে প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট অস্বস্তির মধ্যে ফেলার মতো প্রশ্নটি শুনে ট্রেজারি বেঞ্চে র সদস্যরা তো হতবাক! যে কথা সবাই ভুলে যেতে বসেছিল, তা আবার খুঁচিয়ে তোলা কেন? তাও বিরোধীদের কেউ তুললে না হয় বোঝা যেত। শাসক দলের সদস্যের এ হেন প্রশ্ন তো বিরোধীদের হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। প্রধানমন্ত্রীকে বেঁধার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি বি জে পি-র রাজীব প্রতাপ রুডি। মন্তব্য জুড়ে দিলেন, "সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে আমরা সেখানে (শর্ম-এল-শেখ) গিয়েছিলাম, আর ভারতে ফিরলাম কিনা অভিযুক্ত হয়ে।" কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে এল দারদার কাছ থেকেই। সরকারকে আরও বিব্রত করতে তিনি ফের জিজ্ঞাসা করলেন, "বালুচিস্তানে জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তান যে প্রতিনিয়ত দিল্লির উপর দোষারোপ চালিয়ে যাচ্ছে, তার মোকাবিলায় কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?" জবাব দেবেন কে? প্রধানমন্ত্রী সভায় বসে থাকলেও উত্তর দিতে উঠলেন না। অগত্যা উঠতে হল বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণকে। সেই কৃষ্ণ যিনি সরকারের ব্যয়সংকোচের নির্দেশের তোয়াক্কা না করে রাঝধানী পাঁচতারা হোটেলে বসবাস করে যাচ্ছিলেন মনোমত সরকারি বাংলা পাননি বলে। খবরটা চাউর হয়ে পড়ায় তিনি হোটেল ছাড়তে বাধ্য হন এবং বলেন, টাকাটা তিনি নিজের পকেট থেকেই মিটিয়ে দেবেন। কৃষ্ণর না হয় টাকা আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী হওয়া আমাদের এরাজ্যের তৃণমূল এম পি সুলতান আমেদ? তিনিও তো দিব্যি রাজধানীর পাঁচতারা সরকারি হোটেলে সংসার পেতেছিলেন। জানাজানি হতে নাকি 'দিদি'র নির্দেশে নিজের বাংলোয় ফিরে গেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে হোটেল-বিল গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ লক্ষ টাকায়। দলের চীফ্ হুইপ বলে দিয়েছেন, ওই টাকা সুলতান সাহেবকে নিজেকেই মেটাতে হবে, এটাই নাকি দলের নির্দেশ। কিন্তু দল কি একবার ভেবে দেখেছে, 'সুলতানি আমল' আর নেই, আর এই নয়া সুলতান তো ভোটের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও আয়ের যে হিসাব দাখিল করেছিলেন, তার সব যোগ করলেও ওই টাকা হবে না। তা হলে মেটাবেন কী করে? নিশ্চয়ই সোজাপথে নয়। এ নিয়ে শত অভিযোগ উঠলেও 'দিদি' যে তাতে কান দেবেন না সেটাও বিলক্ষণ জানেন সুলতান সাহেব, কারণ তিনি সংখ্যালঘু! ভোটব্যাংকের স্বার্থে তাঁর সাত খুন মাফ।

দেখে-শুনে

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জবাব দিতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী কৃষ্ণ দলীয় সাংসদের প্রশ্নের ধারে কাছেও গেলেন না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, 'স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পাকিস্তানে আমরা বিশ্বাসী। ভারত তার নিজের স্বার্থেই চায়, পাকিস্তান শান্তিতে থাকুক।' চেপে ধরলেন রুডি, আমরা জানতে চাই, প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোনও ভুল করেছেন কিনা। এবারেও ঝেড়ে কাশলেন না বিদেশমন্ত্রী। শুধু অভিযোগ তুললেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বললেন, বালুচিস্তানে ভারতকে দোষী সাব্যস্ত করতে ওরা সাজানো সাক্ষী- সাবুদ তৈরির জোর ধোপে টিকবে না। কিন্তু পাকিস্তান যে বলে চলেছে, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ সংকলন করছি, যথাসময়ে ভারতের জড়িত থাকার ব্যাপারটা ফাঁস করে দেব।

সেটা পাকিস্তান দিতে পারুক, না পারুক, শর্ম-এল-শেখ-এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি লিখিত দলিল হয়ে রইল তার অস্তিত্ব কি মুখে ফেলতে পারবেন মনমোহন? পারবেন কি সেই বিবৃতির পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করা থেকে পাকিস্তানকে বিরত করতে? পারবেন না। তাই ঘুরে ফিরেই শর্ম-এল-শেখ-এ মনমোহনী ব্লান্ডারের কথা উঠবে। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে গেলে শর্ম-এ সরমের বিবৃতির সুযোগ নিয়ে ইসলামাবাদ পাল্টা অভিযোগ আনা ছেড়ে দেবে কি?

দেখা যাক, বিজয় জওহরলাল দারদার মতো কংগ্রেসে আর ক'জন ছুপা রুস্তম আছেন। দেশের স্বার্থের পক্ষে চরম ক্ষতিকর এরকম ভারত-পাক যৌথ বিবৃতির রূপকার প্রধানমন্ত্রীকে রেয়াত না করার যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন, সেজন্য দেশপ্রেমী মানুষ মাত্রেরই তিনি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

যৌথবাহিনী যেন দুঃস্বপ্ন

(১ পাতার পর)

দখল করে। তাদের দলীয় অফিসও বর্তমানে তালাবন্ধ।

ঘটনা এক ঃ লালগড়ের পাশের দুর্লভপুর গ্রামে রেশন ডিলার প্রদীপ ঘোষের ছেলে বাবলু ঘোষ (দু' সন্তানের বাবা) এবং দুবরাজপুরের কমরেড বুদ্ধ দেব মাহাত নিখোঁজ হয় গত ২৭ জুলাই। ভোলাগাড়াতে তাদের সভায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল জনৈক বন্ধু কমরেড—রাঙামাটি গ্রামের রতিলাল মাহাতোর ছেলে। ওরা আজও ফেরেনি। মাওবাদীরা অপহরণের দায় স্বীকার করেনি। গ্রামে কানাঘুষো—দু' নৌকায় পা দিয়ে চলার পরিণতি। বাবলু পঞ্চায়েতের অধীনে কনট্রাক্টর ছিল আর বুধা মাহাত (কমঃ বুদ্ধদেব) স্রেফ পার্টি করেই ভালো কামিয়েছে বলে খবর।

ঘটনা দুই ঃ গড়বেতা থানার বেনাচাপড়া গ্রামের। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ মতিলাল হাঁসদা'র গ্রাম। প্রায় মাসখানেক আগের ঘটনা। পুরো গ্রামেই জনজাতি সাঁওতালদের বসবাস। মাত্র তিনঘর যাদব গোয়ালা। তাদেরই একজন তারাপদ মণ্ডল। তিনিও কন্ট্রাকটরি করতেন। তার বিরুদ্ধে মাওবাদীদের কাছে অভিযোগ গিয়েছিল ব্যাপক টাকা কমানোর। বাড়ি থেকে দশপা' দূরে বিচারসভা ভর সন্ধ্যাবেলায়। তিনটি বাড়ি থেকেই ছেলে-মেয়ে-বৌ-দেরও ডাকা হয়েছে। চার মহিলা মাওবাদী গিয়ে ডেকে এনেছিল। যেতে বাধ্য। বাড়ির সকলের সামনে মেয়ে কমরেডরা বেধড়ক পেটাল। একটা হাট্টাগোট্টা মানুষ প্রায় আধমরা। কারোও মুখে কথা নেই। ২০/২৫ জন মাওবাদী দলের প্রত্যেকের কাছে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। তবে তারা লাঠি অস্ত্রেও সুনিপুণ। ভয়ে কেউ ছোঁয়নি অর্ধ-সচেতন দেহ। পরে বাড়ির ছেলেরাই দড়ির খাটিয়ায় তুলে বাড়ি নিয়ে আসে। ভয় এতটাই যে, স্থানীয় কোনও ডাক্তারবাবু এলেন না রোগী দেখতে। বাড়ির লোকেদের ডাক্তারীতে একমাস বাদে উঠে দাঁড়াতে পারছে তারাপদ। না, কোনও সংবাদ-মাধ্যমের প্রতিনিধি যায়নি। কারণ, ওখানে বোধ হয় ও সি উদ্ধারের মতো অ্যাডভেঞ্চার নেই।

নেপালকে কেন্দ্র করে জাল নোট ভারতে

(১ পাতার পর)

বের করতে পেরেছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লীর সীমা সুরক্ষা বল বা এস এস বি (বি এস এফ) তাবৎ সীমান্ত চৌকিতে এক নির্দেশ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। এই সতর্ক বার্তার মেমো নং ৩/এম এস বি/ও পি এস/ডি আই জি-পি আর এন/২০০৯ (৫) ৫৮৪৮-৫৯৩৩)। ওই নির্দেশে আরও যে সতর্কবার্তা রয়েছে তা রীতিমতো চমকপ্রদ। শুধুমাত্র ভারতীয় টাকাই জাল হচ্ছে না, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও সিঙ্গাপুরী ডলারও জাল করে ভারতে ঢোকানো হচ্ছে। সম্প্রতি মালদা ও মুর্শিদাবাদে বেশ বড় পরিমাণে জাল নোট গত ২/৩ মাসে ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে খোদ কলকাতায়। জাল নোট-এর কারবারিরা নেপালকেই প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে।

অন্য এক কারণ হলো, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পাক-চক্র (আই এস আই ও তাদের এজেন্টরা) কিছুটা হলেও কোণঠাসা হয়েছে। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে সে, সীমা সুরক্ষা বল (এস এস বি) তাদের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে জাল নোট চেক করার যন্ত্রও রাখছে। ওই চেকার দিয়ে কারেন্সি নোটও চেক করা যাবে। নেপাল-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন চৌকিতে ওই জালনোট চেকার যন্ত্র পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সর্বসাধারণ জনতাও ওখানে গিয়ে জওয়ানদের কাছে বিভিন্ন নোট ফ্রি-তে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারবেন। এস এস বি-র আই জি-শ্যাম সিং জানিয়েছেন,

থানায় ধৃত জাল নোট পাচারকারী।

এবছরের অক্টোবর পর্যন্ত ভারত-নেপাল সীমান্তে ৫০০ ও ১০০০ টাকার জাল নোট ধরা পড়েছে ৬ লক্ষের বেশি মূল্যের। তিনি আরও জানিয়েছেন, এ সময় ভারত-নেপাল সীমান্তের ৭২৬ কিমি পাহারায় দিবারাত্র নিয়োজিত রয়েছেন এগারোটি ব্যাটেলিয়নের এগারো হাজার জওয়ান। রয়েছে ১৯১টি আউট পোস্ট বা 'বি ও পি'। দুটি আউট পোস্টের মধ্যেকার দূরত্ব প্রায় চার কিমির মতো।

বিহার লাগোয়া ভারত-নেপাল সীমান্তে মহিলা ব্যাটেলিয়ানের দু'কোম্পানী ফোর্সকেও বহাল করা হয়েছে। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই মহিলাদের জালনোট পাচারের কাজে ব্যবহার করা হয়।

বিহারের পূর্ব চম্পারণের প্রাক্তন পুলিশ প্রধানের মতে, এটা হলো লো-রিস্ক হাই-প্রফিট ব্যবসা। তবে নিয়মিত ব্যবধানে কেরিয়াররা ধরা পড়লেও মূল পাণ্ডারা বাইরেই থেকে যায়। সবথেকে ভয়াবহ অবস্থা হল ব্যাঙ্কের ভল্টে এবং এ টি এম কাউন্টারের টাকাতেও জাল-নোট পাওয়া। বেশিরভাগ জাল-নোটই হয় ৫০০ বা হাজার টাকার। সেজন্য অনেকেই ৫০০ বা ১০০০ টাকার নোট নিতে চায় না।

সম্প্রতি বিহার সরকার ৫৩টি আউট পোস্টের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ করেছে। অন্যান্য আউটপোস্টের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি অধিগ্রহণ না করায় বেশ কিছু সীমান্তে বেড়ার কাজ থমকে আছে। আর একটা কথা, যে সকল জাল-নোট পাচারকারী ধরা পড়েছে তাদের সিংহভাগই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের।

রাজ্য রাজনীতি

ফরওয়ার্ড ব্লকের হুঁশিয়ারী

বামফ্রন্টের নেতৃত্ব তারাই করবে

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সম্মেলন। অপরটি "রুরাল হেলথ প্রাকটিশনারস" বিল বিধানসভায় গ্রহণ করা।

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর জেলা সম্মেলন-গুলিতে সিপিএম সম্পর্কে যে-সব সমালোচনা উঠেছে—তা আগেই লেখা হয়েছে। এবারে দেখা যাক রাজ্য-সম্মেলনে তাঁর আঁচ কতটা পড়েছে।

রাজ্য-সম্মেলনে প্রতিটি বক্তার একটি লক্ষ্য ছিল—তা-হলো আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কী করে জেতা যায়। এই লক্ষ্যে এক থাকলেও রাজ্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে দু'টি ভাগ দেখা যায়। একদল মনে করেন সিপিএম-কে তথা "কাগুজে" বামফ্রন্ট ত্যাগ করে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জেতার পথ পরিষ্কার করা যাক।

তাঁদের আরও বক্তব্য, বামফ্রন্টে সিপিএম-এর একাধিপত্য, শরিক দলগুলিকে কোনও বিষয় না জানানো এবং বামফ্রন্ট-কে এড়িয়ে সব প্রশাসনিক ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করা। এছাড়া সিপিএম-এর কাজের জন্য বামফ্রন্টের প্রতি মানুষ বিরূপ, তার ফল ফরওয়ার্ড ব্লক-কে ভুগতে হচ্ছে। তাই আর দরকার নেই বামফ্রন্টে থাকার। এছাড়া সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে অশোক ঘোষ তো তৃণমূল নেত্রী-কে 'আমাদের নেত্রী' বলেছিলেন এবং সমস্ত কেলেঙ্কারীর দায়ভার সঙ্গতভাবে সিপিএম-এর উপর চাপিয়ে ছিলেন। কাজেই সিপিএম-সঙ্গ ত্যাগ করা যায়। এই পক্ষ অশোক ঘোষের সিপিএম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার সমালোচনা করেছিল। এই সময় রাজ্য-সম্মেলনে হাতাহাতি হয় এবং স্লোগান ওঠে তৃণমূলের এজেন্ট ঢুকে পড়েছে।

অপরপক্ষ যাঁরা অশোক ঘোষের মতানুসারি, তাঁদের বক্তব্য— সিপিএমের সমালোচনা করে বামফ্রন্টের অ-সিপিএম দলগুলিকে জড়ো করে সিপিএম-কে বামফ্রন্টের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে বামফ্রন্টের নেতৃত্ব আনা হোক। এই মতটি অশোক ঘোষ সমাপ্তি ভাষণে বলেছেন। তিনি বলেছেন—"ফরওয়ার্ড ব্লক কারুর দয়াতে বামফ্রন্টে নেই। সিপিএম ব্যর্থ। তাই বামফ্রন্টে ফরওয়ার্ড ব্লকই নেতা হবে।"

এছাড়া সম্মেলনে যে সব কথা উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—টাটাদের সঙ্গে রাজ্য-সরকারের চুক্তি কেন গোপন করা হয়েছে?

একদল প্রতিনিধি বলেন যে ফরওয়ার্ড ব্লক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনেও একলা চলবে। যেখানেই একলা চলেছে সেখানেই ভাল ফল হয়েছে। কিন্তু অন্য জেলায় সিপিএম-এর কাছে মাথা নত করা হয়েছিল। সিপিএম কর্মীদের মারদাঙ্গা মনোভাব, তাদের নেতৃত্বের ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সর্বোপরি সিপিএম-এর কাজের ফলে সমগ্র বামপন্থী আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেল। সিপিএম-কে দুর্নীতিগ্রস্ত, সংকীর্ণতাবাদী বলা হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের বেশির ভাগ প্রতিনিধি

গোপনে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়ার পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

রাজ্য-সম্মেলনে এক প্রাক্তন ছাত্র-নেতা বর্তমানে অ্যাডভোকেট বলেন, "কোনও অলৌকিক ঘটনা ছাড়া ২০১১ সালে বামফ্রন্টের বিদায় নিশ্চিত।" শ্রীভট্টাচার্য-এর কথায় অবশ্য তৃণমূলের এজেন্ট বলে ধিক্কার দেওয়া হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রকাশ্য সভায় অশোক ঘোষ সিপিএম-কে হঠকারি, সংকীর্ণ, একাত্মবাদী বলে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সিপিএম মনে করে আমরাই সব করবো—এই দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষতিকারক। বামফ্রন্টের দোষ আছে বলেই তৃণমূল এগিয়েছে। এর জন্য সিপিএম-ই দায়ী। সাধারণ-সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস বলেন—"পার্টি যদি নিজের দোষ ত্রুটি সংশোধন না-করে তবে জনগণকেই শুধরে দেবার জন্য এগোতে হবে। বামপন্থার অ্যান্টি-জীবাণু ঢুকেছে। দূর করতে হবে।"

ফরওয়ার্ড ব্লক বামফ্রন্টে থাকবে। সিপিএম বাদে অন্য দলগুলিকে নিয়ে একজোট হয়ে সিপিএম-কে চাপ দেবে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের পদটি প্রধানতম বামপন্থার মহীরুহ অশোক ঘোষকে দেবার দাবী জানাবে এবং জেলায় জেলায় গোপনে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সিপিএম-এর সীট কমাতে চাইবে। এই তত্ত্বটা আসলে বামফ্রন্টের অ-সিপিএম সব পার্টিরই মনোভাব।

এই কলামে আগেই লেখা হয়েছিল, সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদককে সিপিএম-এর মন্ত্রীরা পাত্তা দেন না। তার প্রমাণ হলো রুরাল হেল্থ প্রাকটিশনারস বিল পাস করার মধ্য দিয়ে এবং তা হলো বামফ্রন্টকে না-জানিয়ে;বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে না-জানিয়ে বিধানসভায় এই বিল পাস করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র। ইনি সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এই বিল সম্বন্ধে বামফ্রন্টে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হবে—এই সিদ্ধান্তের একঘন্টা পরেই বিলটি বিধানসভায় পেশ হয়ে গেল!

বিমান বসু স্পীকারকে ফোন করে এনিয়ে বাধা দিলে স্পীকার বলেন "যখন বিল পেশ হয়ে গেছে আর কিছু করার নেই।" বিমান বসু ও বামফ্রন্টকে অগ্রাহ্য করা হলো। এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। বামফ্রন্টে সমালোচনা এবং সিপিএম-এর রাজ্যকমিটিতে বিমান বসু বনাম সূর্যকান্ত মিশ্রের সমালোচনা হবেই।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখা গেল সিপিএম-এর পরাজিত সাংসদ মহম্মদ সেলিম একটি সভায় মমতা ব্যানার্জিকে 'খচ্চর' বলেছেন। এ এক জঘন্য মনোভাব। এ-হেন ব্যক্তিকে কেন পার্টির নেতৃত্বে রাখা হয়? কেবলমাত্র বুদ্ধ বাবুর পারিবারিক বন্ধু বলে?

সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে মন্ত্রী প্রতীম চ্যাটার্জি-এর একটি ছবি বেরিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, মন্ত্রীর জামার তলায় রিভলবার গোঁজা। মন্ত্রী বলেছেন, "এটি সঙ্গেই থাকে, ব্যবহারও করি।" ভাগ্যিস রাম চ্যাটার্জি বেঁচে নেই। তাহলে মন্ত্রী হওয়া বেরিয়ে যেত। কোন নীতি আদর্শ প্রতীম চ্যাটার্জি দেখাচ্ছেন। আরশোলার ওড়ার শখ? জনগণ দেখুন!

দেবতা আর কাকে বলে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অভিরামী। দশ বছরের ছোট্ট একটা মেয়ে। ব্যাঙ্গালোরে বাড়ীর উঠোনে বেশ খেলে-ধূলে বেড়াচ্ছে। অভিরামী যে এভাবে কখনও খেলে বেড়াবে তা ভাবতেই পারেনি ওর বাবা শেখর আর মা মঞ্জুলা। কেননা, গত

বাবা-মা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে

বছরই ওর হৃদযন্ত্রের অবস্থা দেখে ডাক্তাররা একরকম জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। অভিরামীকে তাই এভাবে খেলতে দেখে ওর বাবা-মা-এর চোখে আনন্দে জল এসে পড়ে। তবে এটা সম্ভব হয়েছে হিতেন্দ্রন-এর জন্য। হিতেন্দ্রন আজ নেই— পনেরো বছর বয়সেই তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু হিতেন্দ্রন-এর হৃদযন্ত্র অভিরামীকে আজ বাঁচিয়ে রেখেছে।

চেন্নাইয়ে গত বছর এক পথ দুর্ঘটনায় হিতেন্দ্রন গুরুতর আহত হয়। অনেক চিকিৎসার পরও হিতেন্দ্রনকে বাঁচানো যায়নি। হিতেন্দ্রনের বাবা অশোকন ও মা পুষ্পাঞ্জলি— দু'জনেই ডাক্তার। তাঁরাও জানতেন, ছেলেকে বাঁচানো যাবে না। তাই তারা স্থির করেছিলেন, তেমন কিছু হয়ে গেলে হিতেন্দ্রনের হৃদযন্ত্র অন্য কারও প্রয়োজনে দান করবেন। সেজন্য সেইরকম কোনও যোগ্য লোকের তারা সন্ধান করছিলেন। চেন্নাইয়ে ফ্রন্টিয়ার লাইফলাইন হাসপাতালে ডাঃ এম চেরিয়ান-এর অধীনে এমন একজন রোগীর সন্ধান পেলেন, যার হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রয়োজন। অভিরামী— আট ন'বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। তাই চেন্নাইয়ের পুলিশ কমিশনার আর. শঙ্কর-এর কাছে এব্যাপারে তারা সাহায্য চাইলেন। কেননা, কারও শরীর থেকে হৃদযন্ত্র বার করে যদি না চার ঘন্টার মধ্যে অন্য কারও শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায়, তবে তা আর কাজে আসে না। শেষ পর্যন্ত সেই মুহূর্তটি উপস্থিত হলে পুলিশ বিভাগেরই উচ্চপদস্থ অফিসার সুনীল কুমার নিজের গাড়ীতে তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন। যাওয়ার পথে যাতে কোনও বাধা সৃষ্টি না হয় সেজন্য সব চৌমাথাতেই গ্রীন সিগন্যাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। আর এইসব চেষ্টার ফলে মাত্র ১১ মিনিটে তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলো। ডাঃ চেরিয়ান হিতেন্দ্রনের হৃদযন্ত্র অভিরামীর শরীরে প্রতিস্থাপন করলেন। আর এর ফলেই অভিরামী আজ হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।

২০০৮ সালে কন্যাকুমারিকায় তিন সাগরের সঙ্গমে যখন হিতেন্দ্রনের চিতাভস্ম বিসর্জন করা হচ্ছিল, তখন জেলাশাসক সহ বহু মানুষ প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হয়েছিলেন। হিতেন্দ্রনের বাবা-মা শুধু তার হৃদযন্ত্রই নয়, অন্যান্য অঙ্গও দান করার ব্যবস্থা

অভিরামী

করেছিলেন। এই খবর যখন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হলো তখন হিতেন্দ্রন ও তার বাবা-মা-র প্রতি রাজ্যের মানুষের মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল। হিতেন্দ্রনদের বাড়ী যেখানে সেই বেঙ্গলপট্টু শহরে শোকসভার আয়োজন হলো। অভিরামীর বাবা-মা তো হিতেন্দ্রনকে এক মানব শরীরে দেবতা বলেই দেখে থাকে না, নিজেদের পুজোর ঘরে হিতেন্দ্রনের একটি ছবি তারা রেখে দিয়েছেন। পূজাও করেন।

রিয়াং সমস্যা ও সমাধান কোন পথে

শ্যামাচরণ ত্রিপুরা

প্রায় ১২ বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু মিজোরামের রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধান হলো না। ঘটনার সূত্রপাত ২৯ অক্টোবর ১৯৯৭। মামিত জেলায় একজন মিজো ফরেস্ট গার্ড হত্যার অভিযোগে ইয়ং মিজো এ্যাসোসিয়েশন (ওয়াই.এম.এ) রিয়াং নির্যাতন ও বিতাড়ন শুরু করে। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত মিজোরামের রিয়াং-রা ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। শরণার্থী সংখ্যা ৪৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে কিছু শরণার্থী স্বদেশ ফিরে গেলেও ১২ নভেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ৩২,১৭২ জন রিয়াং শরণার্থী কাঞ্চ নপুর মহকুমায় ছয়টি ক্যাম্পে থেকে যায়। তাদের দাবী ছিল খুবই নগণ্য।—(১) সুস্থ পুনর্বাসন (২) পরিবার পিছু এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। (৩) কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা। জোরামথাংগার নেতৃত্বে গঠিত এম এন এফ সরকার কোনও দাবীই মানতে রাজি হয়নি। আশা করা গিয়েছিল লালথানহাওলার নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস সরকার রিয়াংদের দাবী মেনে নিয়ে রিয়াংদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চ ত করবে। কিন্তু রিয়াংদের কপাল মন্দ। ওয়াই এম এ পথের কাঁটা হওয়ায় লালথানহাওলাও কিছুই করতে পারেননি। ইতিমধ্যে বুংথুয়াম গ্রামের মিজো যুবক জর্জোকিমা সমাজবিরোধীদের হাতে নিহত হলে ওয়াই এম এ রিয়াং সম্প্রদায়কে দায়ী করে দ্বিতীয়বার রিয়াং বিতাড়ন শুরু করে। চলতি বছরের ১৩ নভেম্বর নতুন করে ২০৫ পরিবারের ১৩৫৩ জন রিয়াং ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে আশ্রয়প্রার্থী রিয়াংদেরও অসম সরকার ত্রিপুরায় ঠেলে দেন। ফলে মিজোরামের রিয়াং শরণার্থী সমস্যার আশু সমাধানের পরিবর্তে আরও গভীর সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। জর্জোকিমার হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য রিয়াংরা সি বি আই তদন্তের দাবী করেছিলেন। কিন্তু ওয়াই এম এ তাতে রাজী নয়। মুখ্যমন্ত্রী লালথানহাওলা মূক, বধির সাজতে বাধ্য হন।

রিয়াং সমস্যার কারণ

জাতি হিসাবে রিয়াংরা মিজোরামে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯৬০ পর্যন্ত রিয়াংরা-ই ছিলেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। মিজোরা ৩৯টি ট্রাইবস এবং সাব ট্রাইবসে বহুধাবিভক্ত ছিলেন। অনাদিকাল থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত মিজোরাম ত্রিপুরার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় ত্রিপুরীজাতির বসবাস ছিল। যেমন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, মৈমনসিং (মাই মান সি), ফরিদপুর, লারমাই, পশ্চি ম মণিপুরে। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধন্যমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করার সময় মৈতে ও মিজোরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মণিপুর রাজা পামহেই বা পশ্চি ম মণিপুর (জিরিবাম) মুক্ত করতে সফল হলেও সেনাপতি রায়কৌচাক মিজো বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেনাপতি রায়কৌচাক পাহাড়ের উপর অতি মনোরম দুইটি বৃহৎ দীঘি খনন করেন। নাম দেন রাজানি পুখিরী, রাণীনি পুখিরী। মিজোভাষায় সেটাই হয়ে যায় 'রেংদিল'। 'রেংদিল' এখন মিজোরামের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। লখীচেরা থেকে মাত্র বারো কি.মি. দূরে রেংদিলের অবস্থান। মিজোরামের লখীচেরা হচ্ছে ত্রিপুরার খেদাছড়ার বরাবর পূর্বদিকে অবস্থিত।

রিয়াং কিশোর-কিশোরী

রেংদিলে আজও রিয়াংরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে গোল বাধে। মহারাজ ঈশানচন্দ্রের ছেলে নবদ্বীপ ঠাকুর ছিলেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি নাবালক ছিলেন। সেক্ষেত্রে 'রিজেন্ট' নিয়োগই নিয়ম ছিল। কিন্তু আইন লঙ্ঘন করে মন্ত্রী বিপিনচন্দ্রের ষড়যন্ত্রের বলি হন যুবরাজ নবদ্বীপ ঠাকুর। রাজভ্রাতা বীরচন্দ্রের নামে নকল বোরকারী বা সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দলিল মূলে বীরচন্দ্র ঠাকুর De facto king হিসাবে সিংহাসন জবরদখল করেন। এ নিয়ে প্রিভি কাউন্সিল কোর্টে প্রায় এক যুগ মোকদ্দমা চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজকুমার নবদ্বীপ চন্দ্রের পক্ষে ঠাকুর কর্তারা না দাঁড়িয়ে de facto রাজা বীরচন্দ্রের পক্ষ নেন রাজপ্রাসাদের আকাঙ্ক্ষায়। মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, শৌখিন। সারা বছর লক্ষ্ণৌ-এর নামকরা বাইজীরা লক্ষ টাকার বিনিময়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করতো। ভারতের যত নামকরা সঙ্গীতজ্ঞদের ত্রিপুরার রাজ দরবারে বছরে একবার হলেও আসতে হতো। বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র মতো বিশ্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞরাও ত্রিপুরার রাজদরবারে আসতে বাধ্য হতেন মহারাজার অনুরোধে। তদুপরি মহারাজ বীরচন্দ্র শৌখিন ফটোগ্রাফার, চিত্রকরও বটে। তার শখ ও শৌখিনতা আজকের দিনের পর্ণোগ্রাফীকেও হার মানাতো। এমতাবস্থায় ত্রিপুরার সামরিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রশাসন ছিল কর্মচারী নির্ভর। এই সুযোগে কুকীরা বিদ্রোহ করে বসে। কুকীরা উদয়পুর থেকে শুরু করে চাকলা রোশনাবাদ (জমিদারী) পর্যন্ত আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন করে। কুকীবিদ্রোহ দমনের ক্ষমতা বা উৎসাহ কোনটাই মহারাজ বীরচন্দ্রের ছিল না। কুকীরা রিয়াং যুবতী 'সারতি', ইউরোপীয়ান মেয়ে মিস্ মেরী এবং জনৈকা ব্রাহ্মণ বালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাতে বৃটিশ সরকার যারপরনাই তিক্ত, বিরক্ত হন এবং অপহৃতাদের উদ্ধারের জন্য মহারাজ বীরচন্দ্রকে চাপ দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার প্রায় আদেশের সুরে মহারাজ বীরচন্দ্রকে নির্দেশ দেন—আপনি কুকীবিদ্রোহ দমনে এবং অপহৃতাদের উদ্ধারে অপারগ হলে ব্রিটিশ সরকারকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিন, যা করার আমরা করব। মহারাজ বীরচন্দ্র তাই করতে বাধ্য হন। তিনি ১৮৭০ সালে কুকীবিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকারকে লিখিত সম্মতি দিয়ে দেন। বৃটিশ সরকার শিখ রেজিমেন্ট পাঠিয়ে এক বছরের কম সময়ে কুকীবিদ্রোহ পুরোপুরি দমন করেন। কিন্তু কথামতো বৃটিশ সরকার কুকীরাজ্য ত্রিপুরা রাজার হাতে ফেরৎ দেয়নি। ককবরকে 'হা সিকাম' হয়ে যায় লুসাই হিলস্ এবং লুসাই হিলের শাসনভার অসম সরকারের হাতে হস্তান্তর করা হয়। 'লুসাই' শব্দের অর্থ নরমুন্ড শিকারী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস্তবে মিজোরামের কুকীরা তাই ছিলেন। হা সিকাম লুসাই হিলস্ হওয়ায় রিয়াংদের সর্বনাশ হয়। হতো না যদি রিয়াং হয়ে থাকতেন। 'ব্রু' পরিচয় দেওয়ায় ব্রিটিশরা ধরে নেয় কুকীশ্রেণীর ট্রাইব বা সাবট্রাইব! ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে (জনগণনায়) অসমে বসবাসকারী সব 'ব্রু' কুকী হিসাবে চিহ্নিত হন। আজও কাছাড়, উত্তর কাছাড় (এন সি হিলস), করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং কার্বি আংলং জেলায় বসবাসকারী রিয়াংরা 'কুকী' হিসাবে পরিগণিত। এই একই কারণে রিয়াংদের ব্যাপক ক্ষতি হয় ১৯৫২ সালে। অসমের সর্বত্র সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল চালু হওয়ার সময়। লুসাই হিলসে চাকমা, মারা, লাই আঞ্চ লিক স্বায়ত্ত্বশাসন পেলেও রিয়াংরা বঞ্চি ত হন কুকী ট্রাইব হওয়ার কারণে। ১৯৬০ সালে লুসাই হিলের ৩৯টি কুকী ট্রাইব মিলে 'মিজো' জাতি গঠন করা হলে রিয়াং বা ব্রু-রা আরও বেশী বেকায়দায় পড়েন। 'ব্রু'রা কুকী নয়, ত্রিপুরী, কাজেই মিজো জাতিতে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নই উঠে না। কুকী ট্রাইব হওয়া সত্ত্বেও লাই ও মারাদের মিজো-জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই তারা আঞ্চ লিক স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করতে থাকেন। মিজোরাম পূর্ণরাজ্যে পরিণত হওয়ার পর চাকমা, লাই, মারা আঞ্চ লিক স্বায়ত্ত্বশাসনও স্বশাসিত জেলা পরিষদে পরিণত হয়। অথচ লাই, মারাদের জনসংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল।

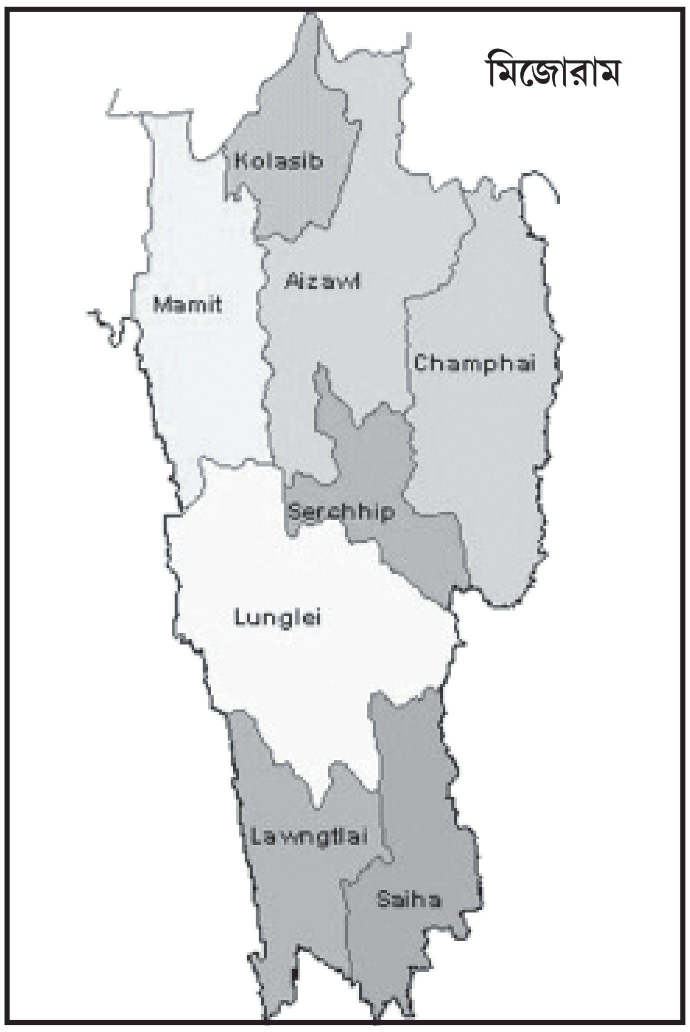

মিজোরামের রিয়াংদের দাবী ছিল, স্বশাসিত জেলা পরিষদ, যাতে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষা করা যায়। ব্রু শব্দটাই যত অনর্থের মূল। রিয়াং হলে ভারত সরকারকে বুঝাতে অসুবিধা ছিল না। এটা অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করোনি'র মতো আত্মশ্লাঘা।

রিয়াংরা নিজেদের 'ব্রু' হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। যেমন ত্রিপুরীরা 'তিপ্রা' হিসাবে। এর মধ্যে দোষের কিছু ছিল না। কিন্তু 'ব্রু' একটা জাতি নয়। ত্রিপুরীজাতির অংশ বিশেষ মাত্র। 'ব্রু'রা অসমে কুকী হিসাবে চিহ্নিত কিন্তু ত্রিপুরীরা ত্রিপুরী হিসাবেই পরিগণিত।

মামিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মিজোদের হাতে রিয়াংরা নির্যাতিত হতে পারে। কিন্তু দারলাক, তাইপালায় সেন্ট পারসেন্ট রিয়াং জনগোষ্ঠী ওয়াই এম এ-দের দ্বারা নির্যাতিত, বিতাড়িত হয় কোন কারণে? আসল কথা রাজনৈতিক শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। কেন্দ্রীয়বাহিনীর সাহায্যে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দাবী আইন সম্মত, সংবিধান সম্মত। কিন্তু নিজেরা আত্মরক্ষার উদ্যোগ নেবেন না কেন? কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের কি অবস্থা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দ্বারা জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দাবী নাকচ করে শেখ আব্দুলা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে ব্রাহ্মণদের বিতাড়ন করেছিলেন ষাটের দশকে।

তারা জীবনে কখনও কাশ্মীরে ফিরে যেতে পারবেন না বলাই বাহুল্য। মিজোরামের রিয়াংদের অবস্থা কি তার চেয়ে ভিন্নতর?

সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ

বক্সার ডাকঘর

প্রাণপ্রতিম পাল ঃ আলিপুরদুয়ার ॥ সমতল থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চতায় ডাকঘর। ভারতীয় ডাক দেশের সব জায়গায় পরিষেবা পেলেও বক্সার ১১টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষের এই ডাকঘরটি সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চি ত হয়েছে। বৃটিশ আমলে তৈরি হওয়া এই ডাকঘরটি বন্ধ থাকায় রীতিমত ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

বৃটিশ আমলে তৈরি এই ডাকঘরটির পোষ্টমাস্টার পুষ্পরাজ থাপা ২০০৮ সালে মারা যান। তারপর থেকে পোষ্ট অফিসে তালা মেরে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। আজও ডাকঘর চালু না হওয়ায় বক্সার ১১টি গ্রামের ১০ হাজার ডুকপা জনজাতির মানুষদের ৪০ কিলোমিটার দূরে কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়ার উপ-ডাকঘরে বিভিন্ন কাজের জন্য আসতে হচ্ছে। সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বয়স্কদের। বর্তমানে স্থানীয় মানুষেরা ১০০ দিনের কাজের টাকা পেতে সমস্যায় পড়ছেন। সরকারি নির্দেশ অনুসারে ১০০ দিনের কাজের টাকা উপভোক্তাদের ডাকঘর অথবা ব্যাঙ্ক থেকে তোলার নিয়ম রয়েছে। বক্সার ওই ডাকঘরটি বন্ধ থাকায় ১০০ দিনের টাকা তুলতে দুর্গম পথ পেরিয়ে রাজাভাতখাওয়া আসতে হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বৃদ্ধদের বার্ধক্য ভাতা পেতেও রাজাভাতখাওয়া উপডাকঘরে আসতে হচ্ছে। অনেক সময় টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। আবার টাকা ডাকঘরে না আসলে শূন্য হাতেই তাদের বাড়ি ফিরে যেতে হয়। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের প্রধান ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়ক এস কে দুবে জানান, দুর্গম এলাকায় কেউ যেতে চায় না। তবে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোহর তিরকি জানান, ঘটনাটি তার জানা নেই। তবে এই ডাকঘরটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করার জন্য লোকসভায় তোলার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি

রাজস্থানে মরুভূমির নীচে সরস্বতীর জলপ্রবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অনেক টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার অন্তঃসলিলা বৈদিক নদী সরস্বতীর অস্তিত্ব কার্যত স্বীকার করে নিল। বৈদিক সরস্বতী নদীর গতিপথের উপগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত চিত্রে স্রোতস্বিনী সরস্বতীর সন্ধান মিলেছে। হরিয়ানার চণ্ডীগড় থেকে কচ্ছের রান পর্যন্ত অস্তিত্ব এখনও বর্তমান।

গত ৩ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় বিজেপি সদস্য প্রকাশ জাবড়েকর কেন্দ্রীয় জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত চিত্রে মাটির নীচে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে কিনা? আর যদি থাকে তাহলে সেই জলকে চাহিদা অনুযায়ী কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন? লিখিত উত্তরে মন্ত্রী জানিয়েছেন—ইসরো এবং রাজস্থান সরকারের ভুগর্ভস্থ জল বিভাগের যৌথ সমীক্ষার ফল জার্নালে প্রকাশ করেছে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর রিমোট সেনসিং' কর্তৃপক্ষ। সেখানে উপগ্রহ গৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক চ্যানেলের চিত্র পরিষ্কার। উত্তর-পশ্চিম ক্ষেত্রে সুগভীর পয়ঃপ্রণালীর হরপ্পা, হরপ্পা-পূর্ব এবং পরের সময়ের ভূগর্ভস্থ চিত্র পাওয়া গিয়েছে। সেক্ষেত্রে জলের উৎস ছিল তখনকার সরস্বতী নদীই। পয়ঃপ্রণালী উন্নতমানের এবং বেশ চওড়া। ওই চ্যানেলগুলির বাস্তবতা কেবলমাত্র বৈদিক সরস্বতী নদীর সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ যশপাল সরস্বতী নদীর বাস্তবতা বিষয়ে এক প্রামাণ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বর্তমানে শ্রী যশপাল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তিনিও ওই প্রবন্ধে সরস্বতী নদীর অস্তিত্বকে একরকম স্বীকৃতিই দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—সমীক্ষায় একদা বহমান নদীপথের সুস্পষ্ট অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। শ্রী যশপাল এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কেননা, ইসরো (চত্রত্মখ)-ই সরস্বতীর উৎস সন্ধানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এবং যশপাল নিজে ইসরোর সহযোগে ১৯৭৩-৮০ পর্যন্ত একটি স্পেস এ্যাপলিকেশন সেন্টার চালাতেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জলের চাহিদা পূরণে কেন্দ্র সরকারের সরস্বতী নদীর অন্তঃসলিলা স্রোত ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়া উচিৎ কিনা? তিনি জানিয়েছেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও বেশি মাত্রায় সমীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন। নদীটা তো গতকালই হারিয়ে যায়নি। সম্ভবত, হাজার দশেক বছর আগে পৃথিবীর মহাদেশীয় প্লেটের বিবর্তনের ফলে নদীর পাতালপ্রাপ্তি ঘটে থাকতে পারে। এসব কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।'

এতদিন কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার সরস্বতী নদীর অস্তিত্বকে স্বীকারই করত না। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জয়পাল রেড্ডি এতদিন সংসদে বলে এসেছেন—নয়টি স্থানে সরস্বতী নদীর উৎস সন্ধানে খোঁজাখুজি হয়েছে। কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকী কেন্দ্র সরকার (ইউ পি এ) এন ডি এ আমলের সমীক্ষার নির্দেশকে আর পরবর্তী অনুমোদন দেবে না। এন ডি এ জমানায় 'সরস্বতী নদী হেরিটেজ প্রকল্প' গৃহীত হয়েছিল। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্টও জমা পড়েছিল। সেজন্য ৩৬.০২ কোটি টাকা অনুমোদন বিচারাধীন ছিল। এখন তা কমিয়ে ৪.৯৮ কোটি টাকায় সীমিত করা হয়েছে।

প্রথম ইউ পি এ জমানায় বামপন্থীদের বিশেষ প্রভাব বজায় ছিল। শীর্ষস্থানীয় বামনেতারা এই প্রকল্পকে সময় ও অর্থের অপচয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি এ এস আই-এর অফিসারদের রীতিমতো ভর্ৎসনা করেছিলেন।

২০০৬ সালে সংসদের পরিবহণ, পর্যটন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি মন্তব্য করেছিল, এ এস আই 'বিজ্ঞানভিত্তিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশাসন' থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবং এক্ষেত্রে এ এস আই-এর মতো একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। এই সাবধানবাণী এসেছিল নদী সম্পর্কে ব্যাপক পরিমাণে প্রামাণ্য তথ্য বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি জমা দেওয়ার পর। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার এবং কেন্দ্রীয় জল-সম্পদ মন্ত্রকের অধীনস্থ 'সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার অথরিটি' প্রভৃতি। কেন্দ্র সরকার অনুধাবনই করে উঠতে পারেনি যে, বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে দেশের বর্ধমান জলের চাহিদা ভূগর্ভে প্রবাহিত সরস্বতী নদীকে পুনরুজ্জীবিত করে মেটানো সম্ভব। এটা করা হলে দেশের উত্তর পশ্চিম ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে কুড়ি কোটি লোকের জলের প্রয়োজন মেটানো যাবে।

২০০২ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জগমোহনের সময়ে প্রথমবার সরকারিভাবে সরস্বতী নদীর বিষয়ে সমীক্ষার প্রেরণা আসে। নদীর গতিপথ নিয়ে উৎখননের নির্দেশ দেওয়া হয়। জগমোহন নিজেই চারজনের এক গোষ্ঠী গঠন করেন—ইসরো-র বলদেব সহায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এস কল্যাণরমণ, গ্লাসিওলজিস্ট ওয়াই কে পুরী এবং জল বিষয়ে পরামর্শদাতা-বিশেষজ্ঞ মাধব চিৎলে। অবশ্য এর আগেই হরিয়ানা ভূগর্ভস্থ জল অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

হরিয়ানার সেচ-বিভাগের অফিসার এস এল আগরওয়াল জানিয়েছেন, কুরুক্ষেত্রের জ্যোতিঃসর থেকে বিবিপুর পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার জুড়ে সরস্বতীর স্রোত পাওয়া গেছে। নদীটিকে পুনরুজ্জীবিত করে সেই জল মাস কয়েকের মধ্যেই ব্যবহারের উপযোগী করা যাবে। সম্প্রতি হরিয়ানা সরকার ১০.০৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে প্রাচীন নদী সরস্বতীর পুনরুদ্ধারকল্পে। এদিকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একযোগে ভূ-পদার্থ অনুসন্ধান এবং বিদ্যুৎ তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। 'সরস্বতী নদী শোধ সংস্থান' নামে একটি এন জি ও-ও কাজ করছে দীর্ঘদিন। তাদের পক্ষ থেকে ২০০৮ ও ২০০৯-এর নভেম্বরে দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে ও এন জি সি, ইসরো এবং জি এস আই-এর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

রাজস্থান সরকারও বেশ গুরুত্ব দিয়েই সরস্বতী নদীর স্রোতধারার সন্ধান ও অন্তঃসলিলকে কাজে লাগাতে যথেষ্ট চেষ্টাচরিত্র করে যাচ্ছে। রাজস্থানে এ এস আই অন্তত চার দশক আগে থেকেই কাজে লেগেছে। শ্রীগঙ্গানগর জেলার কালিবঙ্গা গ্রামে মাটির নীচে সরস্বতী নদীতীরে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাচীন নগর সভ্যতার ধবংসাবশেষ-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রায় দু'দশক আগেই সেন্ট্রাল আর্ড (Arid) জোন রিসার্চ ইন্সটিটিউট' (যোধপুর)-এর একদল বিজ্ঞানী একটি অনুসন্ধান প্রকল্প চালিয়েছিলেন। মাটির নীচে চ্যানেলের সন্ধানও পেয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ওই চ্যানেলগুলি লুপ্ত সরস্বতী নদীর। ১৯৭০ সালেই আমেরিকার উপগ্রহের সংগৃহীত চিত্রে রাজস্থানের জয়শলমীরে মাটির নীচে জলের অবস্থান দেখা গিয়েছিল। ভূগর্ভস্থ জল বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বোরিং করে কূপ খোঁড়ার কথা বলেছিলেন, যেখানে একদা সরস্বতী নদীপ্রবাহ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এজন্য জয়শলমীরের কাছে চন্দনলাঠি বলে একটি এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

গবেষকদের আশ্চর্য করে বোরওয়েলে শুধু যে জল পাওয়া গেছে তাই নয়—জলের পরিমাণ প্রচুর এবং মিষ্টি জল। আবিষ্কারকদের এবার নেশায় পেয়ে বসে। তাঁরা ওই এলাকাতে দু-ডজন কুঁয়ো খোঁড়েন এবং আশাতিরিক্ত প্রচুর সুস্বাদু মিষ্টি জল পান। ওটাই পৌরাণিক সরস্বতী নদীর প্রবাহপথ।

এর কয়েক বছর পর ঐতিহাসিক ডঃ বাকনকর ও সর্বভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার প্রমুখ মোরোপন্ত পিংলে এবং ডঃ কল্যাণসুন্দরম্ রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর থেকে হরিয়ানার সিরসা এবং পাঞ্জাবের ভাতিন্দা পর্যন্ত বিভিন্ন খননস্থল পরিদর্শন করে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। বর্তমান কেন্দ্র সরকারের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে থমকে থাকা ও বন্ধ হওয়া প্রকল্প আবারও সচল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে জলাভাব পূরণ এবং প্রাচীন ভারতীয় উন্নত সভ্যতার দুয়ার জগতবাসীর সামনে উন্মুক্ত ও উন্মোচিত হবে।

প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি বিলাল ঘানি লোন-এর

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নিয়মিত পাক মদত পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কিছুদিন আগেই দেশের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সংসদে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে প্রচুর পরিমাণে জাল নোট এখানে ছড়িয়ে দিয়েছে পাক জঙ্গিরা। আরও একটা কথা প্রকাশ্যে বলতে তিনি দোনামনা করছিলেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পুরোপুরি পাক-মদতে চলছে। প্রণববাবুর সেই না বলা কথাটাই বলে দিয়েছেন বিলাল ঘানি লোন, যিনি জম্মু-কাশ্মীরের জঙ্গিবাদের প্রবক্তা অল পার্টিজ হুরিয়ত কনফারেন্সের কার্যকরী সমিতির এক অন্যতম সদস্য। স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া লোনের বক্তব্য—"কাশ্মীরের প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা পাকিস্তান থেকে আসা টাকা গ্রহণ করে।" তবে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে অর্থনৈতিক সততার গুণগান বিলাল করেছেন তা যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলবে ওই রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে। বিলালের দাবী, তাঁরা দু'পক্ষের (অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান) কাছ থেকে কখনও টাকা খান না, একপক্ষের (অর্থাৎ পাকিস্তান) কাছ থেকেই টাকা নেন।

বিলাল ঘানি লোন

এই দাবীর পর ভগবানের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদজ্ঞাপন করে বিলালের বক্তব্য—"যতই হোক, যাঁরা আর্থিকভাবে আমাদের সাহায্য করছেন, তাদের সঙ্গে তো আর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না!" বিলাল লোনের বক্তব্যের সূত্র ধরে গোয়েন্দাদের অনুমান—পাকিস্তান থেকে প্রভূত পরিমাণে জাল নোট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে আসছে এবং সুকৌশলে তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

গোয়েন্দাবাহিনীর অনুমান যে খুব একটা ভ্রান্ত নয়, তার প্রমাণ লোনের এই বক্তব্যের পর তার বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এই নিয়ে বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য করেনি। ওই বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা সৈয়দ আলি গিলানী বরং বলেছেন—"ভারত বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে কারণ কাশ্মীরের আন্দোলনপন্থী লোকহিতৈষীরা উপুড়হস্ত হয়েছেন।" এই আন্দোলন-পন্থী লোকহিতৈষীদের অন্যতম যে পাকিস্তান তা না বললেও চলে।

এমনিতে আন্তর্জাতিক মহলে একটা ধারণা চালু রয়েছে যে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামীরা ভারত ও পাকিস্তান যুযুধান দু'পক্ষের কাছ থেকেই অর্থ গ্রহণ করেন। এই ধারণা যে অমূলক, বিলাল লোনের বক্তব্যের পর তা মোটামুটি পরিষ্কার। গোপন সূত্রের খবর, বিলাল ২০০৭-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত পাকিস্তানের সরাসরি পে-রোলে ছিল। এরপর পাকিস্তানের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পাক আধিকারিকটি চাইছিলেন বিলাল তাঁর তাঁবে থাকুক কিন্তু বিলাল সেটা না মানাতেই এই বিপত্তি। বিলাল লোনের জন্ম উত্তর কাশ্মীরে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারে। লোন নিজে ব্যবসায় যথেষ্ট সফল। তাছাড়া কাশ্মীরের শ্রীনগর ও আরও এক জায়গায় প্রভূত সম্পত্তি রয়েছে। সেই কারণেই লোন দাবী করছেন—বাইরে থেকে সাহায্য আসুক আর না আসুক তাতে তার অন্তত কিছু যায় আসে না। সবমিলিয়ে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে এবং দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে এদেরই ওপর আস্থা রাখতে চাইছে।

স্টকহোম থেকে কোপেনহেগেন ঃ সাঁঝবাতির রূপকথারা

অর্ণব নাগ ॥ আঠেরোশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক তাপমাত্রার সূচক (গ্লোবাল মিন টেম্পারেচার) সেন্টিগ্রেডের হিসেবে তেরো-র ঘরের একদম নিচেই অবস্থান করছিল। ১৮৬০ সাল নাগাদ এর সূচক-মাত্রা ছিল ১৩.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ওই শতাব্দী-রই শেষদিকটায় এর সূচক নাটকীয়ভাবে চার ঘর বেড়ে চোদ্দ-র আশপাশে পৌঁছে যায়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আবার এই তাপমাত্রার সেন্টিগ্রেড সূচক কমে তেরোর কাছাকাছি নেমে যায়। কিন্তু এরপর থেকেই আবার গ্লোবাল মিন টেম্পারেচারের সূচক ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। গত শতাব্দীর সাতের দশকে এই সেন্টিগ্রেড সূচক-মাত্রা চোদ্দর ঘর ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত মনে হচ্ছিল পরিবেশবিদ আর বিজ্ঞানীরা-ই এই তাপমাত্রার বৃদ্ধি টাকে সামলে-সুমলে নেবেন। কিন্তু এবার মনে হলো, যা ঘটেছে তা নিবারণ করা পরিবেশবিদ কিংবা বিজ্ঞানীদের কর্ম নয়।

এগুলো মনে হবার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনাগুলো পুঁথিগত তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে, এর বাস্তবোচিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা বরাদ্দ করা হয়নি। যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন রাষ্ট্রনায়করা। দ্বিতীয়ত, তাপমাত্রার বৃদ্ধি সংঘটিত হচ্ছে গোটা বিশ্বজুড়ে। এনিয়ে নানা দেশের বিজ্ঞানীর নানা মত। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান ও সেই সাথে পরিবেশের বিষয়গুলোকে ভালভাবে রপ্ত করতে পারেন কিন্তু কূটনীতি নামক বস্তুটা যে আদৌ রপ্ত করতে পারবেন না সেই বিষয়ে গোটা বিশ্ব-ই নিঃসন্দিহান ছিল। সুতরাং উষ্ণতা বৃদ্ধির বিজ্ঞানীয় তত্ত্ব দল বদলে বিজ্ঞান থেকে চলে এল কূটনীতির আঙিনায়।

রাষ্ট্রপ্রধানরা সকলে ১৯৭২ সালের ৫ই জুন, মিলিত হলেন সুইডেনের স্টকহোমে। পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সেটাই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ওই সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁদের কূটজনোচিত চালে মানুষের ওপরই আস্থাজ্ঞাপন করার কৌশল নিলেন। সেই কৌশলে যোগ্য সঙ্গত দিলেন সম্মেলনে আহূত বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদকূল। যার প্রথম পদক্ষেপ— ৫ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা। তখনও অবধি উষ্ণতা-বৃদ্ধির বিষয়টা মোটামুটি একদিকে রাষ্ট্রপ্রধান, অন্যদিকে পরিবেশবিদ—বেশ ব্যালান্স করেই এগোচ্ছিল। কিন্তু গোল বাঁধল ১৯৯০ সাল নাগাদ। ওই বছরে গ্লোবাল মিন টেম্পারেচারের সূচক ছুঁল ১৪.৬-এর ঘর। মানুষের ওপর থেকে যাবতীয় আস্থা উবে গেল রাষ্ট্রপ্রধানদের। ১৯৯২ সালের ৩রা জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হলো বসুন্ধরা শিখর সম্মেলন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কিছু আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশও করা হলো। মোট ১৩০ জন রাষ্ট্রপ্রধান এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলেন। পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য পয়লা নম্বরের ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড। পরিবেশবিদরাও বলে দিলেন বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়নের কারণ অতিরিক্ত কার্বন নির্গমন। যার প্রমাণ—বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যেখানে প্রতি মিলিয়ন আয়তনে কার্বন ডাই অক্সাইড কণার সংখ্যা ছিল ২৯০, তাই-ই ন'এর দশকে গিয়ে পৌঁছয় ৩৭০-এ। তাঁরা তো বলে দিয়েই খালাস। কিন্তু কার্বন নির্গমন ঠেকাবেটা কে? স্টকহোমে রচিত রূপকথার করুণ অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রনেতাদের আর নিশ্চিন্তে থাকতে দিল না। গৃহীত হলো একুশ দফা কর্মসূচী যার পোশাকী নাম 'অ্যাজেন্ডা-২১'।

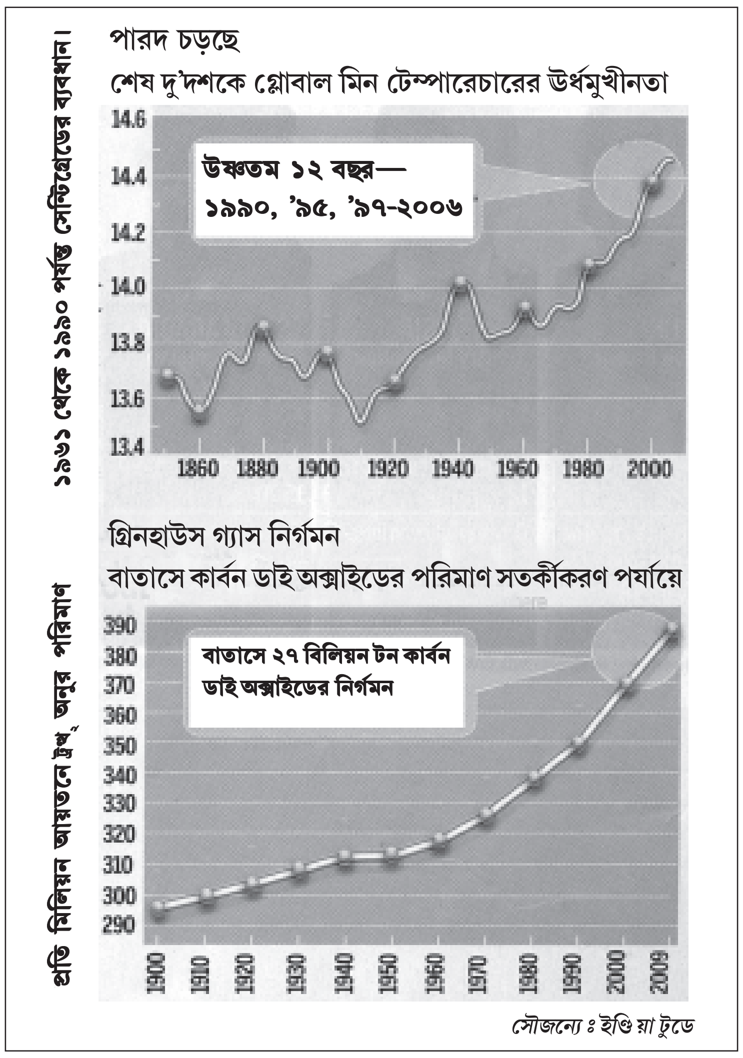

সৌজন্যে ঃ ইণ্ডিয়া টুডে

তবে ওই বসুন্ধরা শিখর সম্মেলনে একটা মহাউদ্বেগের বিষয় লক্ষ্য করা গেল। কূটনীতি যে খুব একটা সহজ-সরল ব্যাপার নয় তা বেশ ভাল করে বোঝা গেল রিও-ডি-জেনিরোতে। উত্তর-দক্ষিণ বিতর্ক নামে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতপার্থক্য রীতিমতো চরম আকার ধারণ করল। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো সবাই একমত হলো যে কার্বন নির্গমন কমানোটা একান্ত জরুরি। কিন্তু উন্নত দেশগুলির বক্তব্য—এই নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে ছোট-বড় সব দেশকে সমানভাবে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর বক্তব্য, আচমকা তারা কার্বন নিঃসরণ কমালে উন্নয়নের গতি ব্যাহত হবে। তার চেয়ে বরং উন্নত দেশগুলিই অধিক কার্বন নির্গমন ঠেকাতে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসুক। ঐক্যমত্যে না পৌঁছনো গেলেও রিও-ডি-জেনিরোতে স্বাক্ষরিত হলো আরও একটি চুক্তি (পড়ুন রূপকথা) যার নাম ইউনাইটেড নেশানস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। চুক্তিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পাশাপাশি গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির নির্গমনের ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ রেখা টানা হলো।

কিন্তু ঐক্যমত্যে না পৌঁছনো ওই চুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে ভেবেই ১৯৯৫ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কনফারেন্স অব পার্টিজ (সি ও পি) (এগুলোও একধরনের রূপকথা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কারণ খালি বক্তৃতাবাজি ছাড়া কাজের কাজ আর কিছুই হয়নি এতে) অনুষ্ঠিত হতে লাগল। বিশ্বের মোট ১৯২টি দেশ এতে অংশ নিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯৭-এ জাপানের কিয়োটো-য় অনুষ্ঠিত সি ও পি-৩ যা কিয়োটো প্রটোকল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বলে পরিচিত। রিও-ডি-জেনিরোতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যে সংঘাত পরিলক্ষিত হচ্ছিল কিয়োটো-তে এসে তা বিন্দুমাত্র কমার সম্ভাবনা দেখা গেল না। যেহেতু সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ১৯৯০ সাল। সেই কারণে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হলো ওই বছরটিই। ৩৭টি শিল্পোন্নত দেশ এবং ইউরোপীয় দেশগুলি (কিয়োটো প্রোটোকল মেনে যারা অ্যানেক্স-১-তে অবস্থিত) রাজি হলো যে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে তারা ১৯৯০-এর তুলনায় ৬ থেকে ৮ শতাংশ হারে কার্বন নিঃসরণ কমাবে। আমেরিকার ক্ষেত্রে এই ধার্য মাত্রা গিয়ে ঠেকল ৭ শতাংশে।

কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। ২০০১ সালে মরক্কোয় কনফারেন্স অব্ পার্টিজ (সি ও পি-৭)-এ মার্কিন দেশের বুশ জমানার প্রশাসন কিয়োটো প্রটোকল মানতে সরাসরি অস্বীকার করে। অবশ্য জর্জ ডব্লুউ বুশের পূর্বসুরী বিল ক্লিন্টনও তাঁর জমানায় কিয়োটো চুক্তি একদমই মানেননি। কিন্তু বুশ পুরো বে-আব্রু করে জানিয়ে দিলেন উন্নয়নশীল দেশগুলো কার্বন নির্গমন একটুও কমাবে না অথচ এনিয়ে যাবতীয় কোপ পড়বে আমেরিকার ওপর তা হবে না। সুতরাং কিয়োটো প্রটোকল আমেরিকা মানছে না। আমেরিকার এই দাবী যে খুব একটা অযৌক্তিক এমন কিন্তু বলা যাবে না। যে চারটে উন্নয়নশীল দেশকে নিয়ে বেসিক গোষ্ঠী নাম দিয়ে একটি জোটবদ্ধ দল গড়ে তোলা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিল। কিয়োটো পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পার্টি অব্ কনফারেন্সের ওপর চোখ যদি বোলাই তবে ইন্দোনেশিয়ার বালি-তে ২০০৭-এ অনুষ্ঠিত সি ও পি-১৩-এর নাম সর্বাগ্রে থাকবে। '৯৭ কিয়োটো থেকে '০৭ বালি—এই দশ বছরে ভারতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৩ শতাংশ হারে, চীনের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ১৫০ শতাংশ সেখানে আমেরিকা মাত্র ২০ শতাংশ। তবে সার্বিকভাবে এই মুহূর্তে আমেরিকার ওই যুক্তি চীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ভারতের ক্ষেত্রে খাটছে না। কারণ ইউনিয়ান অব্ কনসার্নড সাইন্টিস্ট টের দেওয়া তথ্যানুসারে আমেরিকায় বছরে ৫,৯০২ মিলিয়ান মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে। চীনের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৬০১৭ মিলিয়ান মেট্রিক টন, ভারতের ক্ষেত্রে ১২৯৩ মেট্রিক টন। সুতরাং কার্বন নিঃসরণ তথা বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমাতে আমেরিকা ও চীনের-ই উদ্যোগী হওয়ার কথা। কিন্তু চীন তার কূটনৈতিক স্ট্রাটেজী অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমতালিকাভুক্ত হতে চাইছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে উন্নয়নশীল দেশ এই তকমাটা নিয়ে কেউ যত ইচ্ছে শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ (কার্বন জাতীয় যৌগ) নিষ্ক্রমণ করবে এমনটা হওয়ার যৌক্তিকতা নেই।

সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বের উন্নত দেশগুলি কিয়োটো সম্মেলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত বৃহৎ তো দূরের কথা ছোটখাট কোনও পদক্ষেপও নেয়নি কার্বন নিঃসরণ ঠেকাতে। ইউনিয়ান অব্ কনসার্নড সায়েন্টিস্ট টের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, অষ্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ৪১৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন্, জাপানে এই পরিমাণ ১,২৪৬ মেট্রিক টন, কানাডায় ৬১৪, ফ্রান্সে ৪১৭, জার্মানীতে ৮৫৭, ইংল্যাণ্ডে ৫৮৫, রাশিয়ায় ১৭০৪, সৌদি আরবে ৪২৪, ইতালীতে ৪৬৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। প্রতি বছর এখন ২৭ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশছে। ২০০৯-তে প্রতি মিলিয়ান আয়তনে কার্বন ডাই অক্সাইড কণার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯০-এ।

কিয়োটো প্রোটকলকে অস্বীকার করে আমেরিকার লক্ষ্য কোপেনহেগেন সম্মেলন। অষ্ট্রেলিয়া আবার বলছে ২০০৭-এ বালিতে অনুষ্ঠিত সি ও পি-১৩-এর চুক্তিপত্রই অনুসরণ করবে তারা। ১৯৯০-এর তুলনায় ২৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমাবে বলেও কমাতে পারেনি জাপান, কানাডারও একই দশা। ফ্রান্সের আঙুল উন্নয়নশীল দেশগুলির দিকে। আমেরিকার হাত ধরতে চাইছে জার্মানী। ইংল্যান্ড, রাশিয়া, সৌদি আরব কিংবা ইতালি কেউ-তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। আসলে উন্নত জি-১৪ ভুক্ত দেশ আর উন্নয়নশীল জি ৭৭ ভুক্ত দেশগুলি কেউ কাউকে একটুকুও জমি ছাড়তে রাজি নয়। তবে উন্নয়নশীল (?) দেশ চীন কার্বন নিঃসরণে বিশ্বে এই মুহূর্তে এক নম্বরে সুতরাং তাদের পালানোর পথ নেই।

আসল কথাটা হলো, উন্নত দেশই হোক, উন্নয়নশীলই হোক বা উন্নয়ন-কামী-ই হোক সবাই চাইছে কিছুটা সময় নিয়ে নিতে। একের পর এক রূপকথা রচিত হয়েছে স্টকহোমে, রিও-ডি-জিনারো কিয়োটো, বালি এমনকী কোপেনহেগেনেও। এছাড়া '৯৫ থেকে '০৯ মাত্র চোদ্দ বছরের ব্যবধানে ১৫টি পার্টি অব্ কনফারেন্স (সি ও পি) নামক রূপকথাও রচিত হয়েছে। গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রাও ২০০৫ থেকে বাড়তে বাড়তে ২০৫০ হয়েছে। পরবর্তী রূপকথার দিন ধার্য হয়েছে ২০১০-এ মেক্সিকোয়। সাঁঝবাতির আলোয় সেখানে আবার বসবেন ১৯২টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। আবার রচিত হবে রূপকথারা।

বিশ্ব পরিবেশ সং

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রশ্ন নিয়ে বিশ্ব এখন উত্তাল। লড়াই মূলত শিল্পোন্নত আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির। কোপেনহেগেনে সদ্য সমাপ্ত হয়েছে মন্ত্রীস্তরের বৈঠক। গ্রীনহাউস গ্যাস কমানো, দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় নিয়ে মতৈক্য হয়নি। উন্নত দেশগুলির দাবী 'সিঙ্গল লিগাল ইন্সট্রুমেন্ট' অর্থাৎ পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একই নিয়ম বলবৎ হউক। উন্নয়নশীল দেশগুলির জোট জি-৭৭ (৭৭টি দেশের জোট) এই সিঙ্গল লিগাল ইন্সট্রুমেন্ট-এর দাবী মানতে রাজি হয়নি। ডিসেম্বর -'০৭-এ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত পরিবেশ সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ২০১২ সালে ফুরিয়ে যাওয়ার পরে বিশ্বের পরিবেশ নীতি কী হবে তা নির্ধারিত হওয়ার কথা এই কোপেনহেগেন সম্মেলনেই। কিয়োটো প্রটোকলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে 'উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় অধিক পরিমাণ দূষণ কমাবে এবং উন্নত দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে তবেই উন্নয়নশীল দেশগুলি দূষণ কমাতে উদ্যোগী হবে। সুতরাং কোপেনহেগেন সম্মেলনেও যে উন্নত দেশগুলি সম্মত হবে (এই প্রতিবেদন প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত) তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

এটা সত্য যে বিশ্ব পরিবেশ আজ
অবস্থায় পৌঁছেছে। ২০০৭-এর ফেব্রু
পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানে
নিরীক্ষা রিপোর্টে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে আজ
যদি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হতে থ
শতাব্দীর শেষে বিশ্বের উষ্ণতা ৬ ডিগ্রি
পাবে এবং তার ফলে পৃথিবীর বুক থেকে
ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তার আগেও

ভারতের ক্ষেত্রে এটা আরও চিন্তার
সালের মধ্যে হিমালয়ের হিমবাহ সম্পূর্ণ
যেমন বিভিন্ন নদ- নদী, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু
নদীগুলিও পর্যন্ত গ্রীষ্মে শুকিয়ে যেতে প
শুকিয়ে গেলে আমাদের কৃষি, পানীয় জ
কী অভিশাপ নেমে আসবে তা কল্পনাও

ডিসেম্বর '০৯-এর কোপেনহেগে
পরিবর্তন সম্পর্কিত সম্মেলন মানব সভ্য
একটি শেষ প্রচেষ্টা। আজকের এই অ
দেশগুলিই অপরাধী। ২০০ বছর ধরে
আগুনে বিশ্বের জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আ
উন্নত দেশে গড় কার্বন ডাই অক্সাইড
পরিমাণ মাথাপিছু ২০ টন আর সেখ
দেশগুলিতে এর পরিমাণ মাত্র ০.১ টন।

মানব-জাতির কল্যাণে উষ্ণায়ন রোধে কোপেনহেগেনের বিশ্ব-পরিবেশ সম্মেলন শেষপর্যন্ত কতটা সফল ?

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত)

এই সুন্দর পৃথিবীতে উষ্ণায়ন ঘটছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ তার দৈর্ঘ্য হারিয়ে ফেলছে। হিমালয় পর্বতের রূপোলী চূড়োগুলি গলে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে ধূসর রুক্ষ পাথর। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রতে জলস্ফীতি বন্যায় গ্রাম, নগর, শহর, ক্ষেত-খামার ভাসিয়ে দিচ্ছে। তারপর নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। আরাবল্লীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে মরুভূমি শহরের দিকে এগিয়ে আসছে, প্রচণ্ড জলাভাব। ইন্দিরা গান্ধী শহরে আর জল নেই। গ্রামের বধূরা জল আনতে দূর থেকে দূরান্তরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সুমেরু-কুমেরুর চাপ চাপ বরফ গলে যাচ্ছে। সমুদ্রে জলস্ফীতি ঘটছে। ভূমধ্যসাগরের ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলি সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। কোলকাতা মুম্বাইকেও হয়ত সমুদ্র গ্রাস করবে। বর্ষায় ধান রোওয়া বোধহয় আর হবে না কারণ বর্ষা সময়ে আসবে না, আর যখন ফসল ঘরে তোলার সময় তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি ক্ষেত ভাসিয়ে দেবে। শীতকালে আম পাকবে, শাক-সবজি হবে না।

এমন চিত্র কিছু সত্য, কিছু অসত্য, অতিরঞ্জিত প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন পত্র পত্রিকায় আমরা দেখছি। এই ঋতুর পরিবর্তন, জলাভাব, ক্রমবর্ধমান দাবদাহ, খাদ্য-শষ্যের অপ্রতুলতা সমস্ত বিশ্বের উষ্ণায়নের কারণেই ঘটতে চলেছে। কারণ পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ। বিশ্ববাসী জানতে পেরেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন ধনী রাষ্ট্রে বহুবর্ষব্যাপী শিল্পায়নের তোড়ে যে গ্রীন হাউস গ্যাস বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে ছেয়ে গেছে তার অন্যতম হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড, যার ঘনত্ব এই উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ। অর্থাৎ এই ভাবে চলতে থাকলে এই পৃথিবী আর মানুষের জীবনধারণের যোগ্য থাকবে না। এইসব গ্রীন হাউস গ্যাস এবং কার্বন ঘনত্ব না থাকলে পৃথিবীর তাপমান সাধারণভাবে ৩২-৩৩° সেলসিয়াস থাকা উচিত। অন্য যেসব গ্রহে গ্রীন হাউস গ্যাস, যেমন কার্বন ঘনত্ব বেশী সেইসব গ্রহে উষ্ণতাও বহু বহুগুণ বেশী। এইসব তথ্য থেকেই বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর উষ্ণায়নের কারণ বুঝতে পেরেছেন। আজ সমগ্র বিশ্ব এই বিপদ থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার প্রয়াসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদগিরণ সীমিত করার চেষ্টা করছেন। কয়েক বছর আগে কিয়োটো প্রটোকল গ্রহণ করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর পরিসংখ্যান নিয়ে স্থির করেছিলেন কোনও রাষ্ট্রে গড় জাতীয় উৎপাদনের (জি ডি পি) প্রতি দশলক্ষ ডলার পিছু এক মেট্রিক টন কার্বন নিঃসরণ ধরে নিয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের গ্যাস নিঃসরণের হিসাব করতে হবে এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১২-র মধ্যে ১৯৯০ এর নিঃসরণের অন্ততঃ ৫ শতাংশ কমিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রই নির্দেশ মানেনি। এই বিষয়ে সহমত সৃষ্টি না হওয়ায় কোনও চূড়ান্ত চুক্তিও সাক্ষরিত হয়নি। বিশ্বের দরিদ্র উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলির দাবী এই উষ্ণায়নের জন্য উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলিই প্রধানত দায়ী। তার জন্য তাদের খেসারত দিতে হবে। প্রথমতঃ সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলিকে বেশীমাত্রায় কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে। যেহেতু দরিদ্র, উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলির শিল্প প্রয়াস তথা অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা ব্যহত হবে তাদের উন্নত প্রযুক্তি দিতে হবে এবং আর্থিক সহায়তাও দিতে হবে। এটা সম্ভব হবে যদি মোট জাতীয় উৎপাদনের উপর হিসাব না করে, রাষ্ট্রের মাথাপিছু উৎপাদনের হারের উপর হিসাব করা হয়। যেহেতু দরিদ্র রাষ্ট্রে জনসংখ্যা অনেক বেশি, মাথাপিছু হিসাবে তাদের নিঃসরণ কমানোর পরিমাণ অনেক কমে যাবে। যেমন জাতীয় উৎপাদনের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া যথাক্রমে আনুমানিক ৫.৯৬, ৫.৩২ এবং ১.৭০ বিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ করছে। কিন্তু মাথাপিছু জাতির উৎপাদনের হিসাবে ওই তিন রাষ্ট্রের বাৎসরিক নিঃসরণ যথাক্রমে ২৪, ৪ এবং ১৩ টন হবে, যা অনেক গ্রহণযোগ্য হবে। অন্য উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলির কার্বন নিঃসরণ প্রায় নগণ্য। ভারতের জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে নিঃসরণ ১.১৭ বিলিয়ন টন এবং মাথাপিছু হিসাব করলে বাৎসরিক .০২ টন হিসাব দাঁড়াবে। অর্থাৎ মানবজাতি যখন সংকটের মুখে তখনও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলি প্রয়াস করছে যাতে তাদের দায়িত্বের পরিমাণ যতটা কম করা সম্ভব হয়, সেই চেষ্টা। নিঃসরণ কমানোর প্রস্তাবও ভারত মেনে নিয়েছে। ভারত এবং চীন এই বিষয়ে সম্মিলিত ভাবে কোপেনহেগেন আলোচনায় অংশগ্রহণে সহমত হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যেও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। দুজন প্রতিনিধি কোপেনহেগেন যেতেই অনীহা প্রকাশ করে ছিলেন। পরে জানা যায় মতভেদ দূর হয়েছে এবং তাঁরা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করছেন।

কোপেনহেগেনে পরিবেশপ্রেমীদের বার্তা।

এই দড়ি টানাটানির মধ্যে বর্তমানে কোপেনহেগেন-এ "বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা"র আন্তর্জাতিক আলোচনা চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি টড স্টার্ন ঘোষণা করেছেন, ঠিক কথা, বিগত ২০০ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পায়ন ঘটিয়েছে এবং পরিবেশ দূষিতও হয়েছে, কিন্তু এতদিন এই বিষয়ে তাঁদের কোনও ধারণা ছিল না। আজ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এই বিষয়ে তাঁদের দোষারোপ করার কোনও কারণই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রকেই কোন অর্থ সাহায্যও করতে পারবে না। উন্নত প্রযুক্তি নিশ্চয়ই দেবে। তবে তার জন্য মূল্য দিতে হবে। দুঃখের বিষয় টড স্টার্ন কেন মার্কিন প্রশাসনের কেউই হয়ত ভারতের বেদ বিজ্ঞানের কোনও খবর রাখেন না। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বিগত ২০০ বছর হয়তো তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু অজ্ঞ, দরিদ্র হলেও ভারতীয় মুনিঋষিরা ৭০০০ বছর আগেই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য (ইকো ব্যালেন্স) সম্পর্কে যথেষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, যা আজও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিন্তিত, কারণ চীন, ভারত ব্রাজিল শিল্পন্নোয়ন বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে কার্বন নিঃসরণ যথেষ্টই বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। যদিও ভারত এবং চীন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ২০০৫ কে ভিত্তি বছর ধরে নিয়ে যথাক্রমে ২০-২৫ শতাংশ এবং ৪০-৪৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ ২০২০-র মধ্যে কমানোর অঙ্গীকার করেছে। সর্বোচ্চ নিঃসরণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে আগামী ২০২০-র মধ্যে তারা ১৭ক্ম শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমাবে। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধির দাবী ভারতের এই অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক পরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। মাথাপিছু নিঃসরণ পদ্ধতির পরিবর্তে মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবেই

প্রেসিডেন্ট ওবামা চাইছেন কোপেন হেগেন সম্মেলনে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি সাক্ষরিত হোক। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও ওই সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভারত এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী ওই সম্মেলনে গিয়েছেন।

বিশ্ব আবহাওয়া সংগঠন তাঁদের প্রতিবেদনে জানিয়েছেন একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্বে উষ্ণায়ন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, অতীতে তার কোনও উদাহরণ নেই। বেনজির, বহুদিন থেকেই শুনে আসছি, যে গ্রীন হাউস গ্যাস বিশ্বের পরিমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে (ওজন লেয়ার) এবং বিশ্বকে উষ্ণতা এবং মহাকাশের অন্য ক্ষতিকারক কিরণ থেকে রক্ষা করে আসছে, সেই 'ওজোন লেয়ার' ছেঁদা হয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বের পরিবেশ মনুষ্যজাতির পক্ষে বাসযোগ্য থাকবে না। কার্বন নিঃসরণ ওই পরিমণ্ডলে পূঞ্জিভূত হয়ে উষ্ণায়নের সূচনা করছে। এই দশকে তারই প্রকোপ দেখা গিয়েছে। অ্যাড-হক ওয়ার্কিং প্রুফ অন লং-টার্ম কো-অপারেটিভ অ্যাকশন (এ ডব্লু জি-এল সি এ), সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি খসড়া প্রস্তাব আলোচনার জন্য পেশ করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবে ভারত সহ বিভিন্ন উন্নতিশীল রাষ্ট্রের অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ভারত, চীন, ব্রাজিল দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফ্রিকার অন্যরাষ্ট্র সমূহ একটা নতুন খসড়া প্রস্তাব পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই বিকল্প প্রস্তাব পেশের আগে তাঁরা দেখে নিতে চান, অন্যান্য রাষ্ট্রের মতামত ওই সরকারি প্রস্তাবের বিষয়ে কি রকম হয়। ওই খসড়ায় বলা হয়েছে আগামী ২০২০-তে বিশ্বে কার্বন নিঃসরণ চূড়ায় পৌঁছুবে এবং তারপর থেকে সমবেত প্রচেষ্টায় কমতে আরম্ভ করবে। ২০৫০-এ বিশ্বের কার্বন নিঃসরণ ১৯৯০ এর ভিত্তি বছরের তুলনায় অন্ততঃ ৫০ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণের বিষয়টির উপরই ভারতের দ্বিমত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ২০৫০-এ ৫০ শতাংশ নিঃসরণ রোধ করতে গেলে উন্নতিশীল দেশেরও নিজের উপরই প্রবল চাপ আসবে। কিন্তু তাদের প্রযুক্তি এবং অর্থ দিয়ে সহায়তার বিষয়টি উহ্য থেকে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রটোকল অনুযায়ী আগে প্রস্তাব নিয়েছিল একটি তহবিল গঠন করা হবে এবং তারা দশ বিলিয়ন ডলার অগ্রীম দেবে। অন্য ধনী রাষ্ট্রও সেই তহবিলে অর্থ দেবে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজন মতো সেই তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই খসড়ায় তার কোনও উল্লেখ নেই। এই বিষয়টি আগে স্থির হওয়া উচিত। আবার ২০১৬-তে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কার্বন নিঃসরণের কার্যায়ন এবং প্রকৃত তথ্য জানার জন্য আরও একটি সম্মেলনের কথা বলা হয়েছে যেখানে এই বিষয়ে পরিচর্চা হবে। এ বিষয়েও ভারতের প্রশ্ন রয়েছে।

এইসব বিষয়ে ওই খসড়া প্রস্তাবে কি ধরনের পরিবর্তন করার দাবী ওঠে, তার উপরই নির্ভর করবে ভারত-চীন-ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিকল্প খসড়া পেশ করা হবে কিনা। তবে ওই খসড়া প্রস্তাব সম্পূর্ণ নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয় বলেই ভারতের অভিমত। কিন্তু আলোচনায় ধনীরাষ্ট্রগুলি কিয়োটো প্রটোকল সমাপ্ত করে দেওয়ার প্রয়াস করায় আফ্রিকার দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি প্রতিবাদ করে সভাকক্ষ ত্যাগ করে। ভারত-চীন, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টায় কিয়োটো প্রটোকল নিয়েও আলোচনা আরম্ভ হয়।

আর একটা বিষয় বিশেষ চিন্তার কারণ সেটা কার্বন নিঃসরণ নিয়ে বাণিজ্য। যেমন কোন উন্নত রাষ্ট্র নিজেদের অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের দায় কোনও উন্নতিশীল রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে। কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা হবে তার কোনও হদিশ এখনও আসেনি। বিশ্ব যখন এমন বিপদের সম্মুখীন উন্নত রাষ্ট্রগুলি তখনও তাদের সমৃদ্ধি ধরে রাখার প্রয়াস করছে এবং পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষার দায় অনেকটা দরিদ্র দেশগুলির ঘাড়ে চাপাবার প্রয়াস চালাচ্ছে।

আলোচনা যেভাবে এগোচ্ছে, কোপেনহেগেনে কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি আদৌ সাক্ষরিত হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা না করে বিশ্ববাসীর সমূহ উন্নতি এবং মানব জাতির কল্যাণের বিষয় চিন্তা করতে হবে।

এই বিশ্ব শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়। অসীম ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র ছয় বিলিয়নের এই মানবজাতি পৃথিবী গ্রহে একাকী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তার কোনও স্বজন ও আত্মীয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন গ্রহে, উপগ্রহে আছে কি? পৃথিবীকে মানব প্রজাতির বসবাসের অনুকুল করে রাখার দায়িত্ব সমস্ত মানবগোষ্ঠীকেই নিতে হবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সেই জন্যই গেয়েছেন।

"মহাবিশ্বে মহাকাশে, মহাকালও মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে..."

আশা করব, কোপেনহেগেন সফল হবে। বিশ্বের উষ্ণায়ন রোধ করতে মানব প্রচেষ্টা সফল হবে, সংকীর্ণ লাভক্ষতির দড়ি টানাটানি শেষ হবে এবং পৃথিবী মানব জাতির একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসাবে 'অমৃতের পুত্র'দের জন্য এমন সুন্দরভাবেই বেঁচে থাকবে।

া সংকট ও ভারত

য বিশ্ব পরিবেশ আজ এক বিপজ্জনক ছে। ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে জলবায়ু ন্ত আন্তঃসরকার প্যানেল তাদের চতুর্থ হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে আজকের এই গতিতে অক্সাইড নির্গত হতে থাকে, তাহলে এই বিশ্বের উষ্ণতা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি ফলে পৃথিবীর বুক থেকে প্রাণের অস্তিত্ব য়ে যাবে। তার আগেও এটা ঘটতে পারে। ক্ষেত্রে এটা আরও চিন্তার কথা যে, ২০৩৫ ালয়ের হিমবাহ সম্পূর্ণ গলে যেতে পারে; - নদী, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু ও তাদের শাখা গ্রীষ্মে শুকিয়ে যেতে পারে। এইসব নদী ামাদের কৃষি, পানীয় জল, স্বাস্থ্যের ওপর মে আসবে তা কল্পনাও করা যাবে না। ৯-এর কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায়ু র্কিত সম্মেলন মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখার ষ্টা। আজকের এই অবস্থার জন্য উন্নত রাধী। ২০০ বছর ধরে তাদের লোভের জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আজ বিপন্ন। ৩০টি ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমনের ছু ২০ টন আর সেখানে উন্নয়নশীল পরিমাণ মাত্র ০.১ টন।

স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশেষ করে ভারত ও চীন দাবী করছে যে, উন্নত দেশগুলিরই উচিত এই গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনতে নির্দিষ্ট মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলি তো সবে উন্নয়ন শুরু করেছে।

উল্টো দিকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্বে উন্নত দেশগুলি ভারত ও চীনের ওপরে এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে সরব হয়েছে। এদের মতে, এ দুটি দেশ অতি দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। তাই গ্যাস নির্গমনের গতিও বেড়ে চলেছে। সুতরাং এদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে আমেরিকার শয়তানি। শেষ পর্যন্ত তিনটি আইন করে আমেরিকার কাছ থেকে সবুজ রক্ষার প্রযুক্তি সরবরাহে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কার্বন মুক্তি নিয়ে বানিয়াবৃত্তি উন্নত দেশগুলিই করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কোপেনহেগেনে যদি নিম্নোক্ত নীতিগুলি গৃহীত হয়, তবেই ভারত পরিবেশ সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে— (১) উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য সমান কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। (২) সবুজ প্রযুক্তিতে সকলের প্রবেশাধিকার দিতে হবে। (৩) সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৪) কার্বন বাণিজ্য মেশিনারি বন্ধ করতে হবে। (৫) নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্মসূচী পরিত্যাগ করতে হবে।

চিঠিপত্র

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি

বিগত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩২ বছরের বামফ্রন্টের শাসনে জনবিরোধী ভ্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতির দরুণ অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সারা বিশ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি, বৃষ্টি কম হওয়া, চাষযোগ্য জমি ক্রমাগত শিল্পে ব্যবহার করা এবং কৃষি উৎপাদন কমিয়ে শিল্পের দিকে নজর দেওয়া— প্রভৃতি কারণে দেশে পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন কমেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অনেক আগে থেকেই বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রের ও রাজ্যের শাসক দল এ বিষয়ে কোনও কর্ণপাত করেনি। ফলে আজ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে, অথচ উৎপাদন সেই অনুসারে বাড়েনি। ফলে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম প্রতিদিন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না। চাল, ডাল, তেল, আটা, ময়দা ইত্যাদি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, শাকসব্জির দামও কম নয়। নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আলু ও পেঁয়াজের দাম ঊর্দ্ধমুখী। কোনও সরকারের এবিষয়ে কোনও চিন্তা ভাবনা নেই। তারা হিংসায় উন্মত্ত। তারা এখন সংখ্যালঘু তোষণ ও ভজনায় ব্যস্ত। তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জেতে কিন্তু মানুষের কথা আর ভাবে না। তাই আজ শতকরা ২০ ভাগ মানুষ ক্রমশ ধনী থেকে ধনীতর হচ্ছে, আর শতকরা ৮০ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যাচ্ছে। আজ সাধারণ মানুষ সব ক্ষেত্রে শোষিত, অত্যাচারিত নিপীড়িত ও নির্যাতীত। কোনও সমাধানের ব্যবস্থা নেই। অথচ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারের সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে ছিল। ডঃ মনমোহন সিং-এর আমলে জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত ঊর্দ্ধমুখী হতে থাকে। কংগ্রেস, টি. এম. সি. ও সি পি আইএম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সেরকম কোনও আন্দোলনে সামিল হয়নি। বি জে পি-র ৩০শে নভেম্বরের বন্ধ সফল হয়েছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাড়া দিয়েছে।

অধ্যাপক আশিস রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া-৩

বিজেপি-র বন্‌ধ

সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি-র দেখানো পথে ৩০ নভেম্বর বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি সফল বন্‌ধ উপহার দিয়ে প্রমাণ করেছে যে এ রাজ্যে বিজেপি একটি সাইনবোর্ড সর্বস্ব পার্টি নয়, বরং জনসমর্থনের নিরীখে একটি যথেষ্ট শক্তিশালী পার্টি। ওই একই ইস্যুতে ২৪ নভেম্বর এস ইউ সি-র ডাকা বাংলা বনধ সুপার ফ্লপ করার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ মহল, এক শ্রেণীর জনতা ও বিজেপি বিরোধী বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সংবাদপত্রগুলি ধরেই নিয়েছিল যে বিজেপি-র ডাকা বাংলা বন্‌ধের ভাগ্যে ঘটবে একই পরিণতি। কিন্তু বিজেপি বিরোধীদের সব জল্পনা-কল্পনা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করে এতটাই সফল হয়েছে যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে সবাই। আর সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই তারা সমস্বরে বিজেপি-র বিরুদ্ধে শুরু করেছে হুক্কা হুয়া রব। বিজেপি-র দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে রাশি রাশি ক্রোধ, হিংসা, নিন্দা এবং অসৌজন্যমূলক বাক্যবাণ। নিন্দা ও সমালোচনার বহর দেখে এটাই মনে হয়েছে যে এ রাজ্যে বিজেপি বন্‌ধ ডেকে এবং তা সফল করে যেন মহাঅপরাধ, অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করেছে। ভাবখানা এই যেন, এ রাজ্যে কেউ কোনদিন বন্‌ধ ডাকেনি, ট্রাম-বাস জ্বালায়নি, ট্রেন-বাস-যানবাহনের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেনি, জোর-জবরদস্তি দোকানপাট বন্ধ করেনি, অফিস-আদালতে ভাঙচুর চালায়নি, রাস্তায় নেমে গুণ্ডামি-বোমাবাজি করে নিজেদের আধিপত্যের জানান দেয়নি। আর বিজেপি বন্‌ধ ডেকে এরাজ্যের মহাসর্বনাশ সাধন করেছে।

এখন দেখা যাক্ কে কতটা বিষোদ্‌গার করেছে 'নন্দঘোষ'দের বন্‌ধের বিরুদ্ধে ঃ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া—সিপিএমের মদতেই এই হাঙ্গামা। তিনি আরও বলেছেন, বিজেপি-র ডাকা বন্‌ধকে সফল করতে সিপিএমই কোমর বেঁধে আসরে নেমেছিল। বহু জায়গায় সিপিএম ক্যাডাররা বিজেপি-র ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে চালিয়েছে তাণ্ডব। পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মানস ভূঁইঞা-র প্রতিক্রিয়াও ওই একই—বন্‌ধে সিপিএমের পূর্ণমদত ছিল। আর এক প্রাক্তন তৃণমূলী এবং হালে আবার কংগ্রেসী সুব্রত মুখোপাধ্যায় (তৃণমূলীদের দৃষ্টিতে তরমুজ) আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, তাঁর হাতে নাকি বন্‌ধে সিপিএম মদতের প্রমাণ আছে। যদিও সেই প্রমাণপত্র তিনি আজও দেখাতে পারেননি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুর উক্তি, সোমবার বন্‌ধের নামে যা হয়েছে তা ন্যক্কারজনক। সিপিএমের কোনও কর্মী বন্‌ধের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। তবে বিজেপি-র পুরানো জোট সঙ্গী হিসেবে তৃণমূল বন্‌ধকে সমর্থন করতেও পারে। কিন্তু কংগ্রেস-তৃণমূল সমর্থক কিছু টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র পরিবর্তনের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বিজেপি-র বিরুদ্ধে এমন সব ভাষায় প্রচার চালিয়েছে যে বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকরাও তাতে লজ্জা পেয়েছেন। আসলে বিজেপি-র এই হঠাৎ উত্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংবাদ মাধ্যমগুলি চম্‌কে গিয়েছে। তারা ভাবতেই পারেনি, বিজেপি-র এভাবে বাড়-বৃদ্ধি ঘটেছে।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া

বিচারের বাণী

সাম্প্রতিক (১৯শে নভেম্বর) বাংলাদেশের রূপকার মুজিবর রহমানের হত্যাকারীরা সাজা পেল অর্থাৎ ঐ পরিবারের বিদেহী আত্মারা সুবিচার পেল, আর জাতি অনেকটা কলঙ্ক মুক্ত হল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাষ্ট ঢাকার ধানমণ্ডির বাড়ীতে সপরিবারে ২২ জন নৃশংসভাবে নিহত হন পশ্চিম পাকিস্তানি তথা পশ্চিমী দালালদের হাতে। এই অশান্তির ধারক ও বাহকদের কাছ থেকে বাংলাদেশ ছিনিয়ে নেওয়ার শাস্তি। এই শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে বৃটিশ শাসনাধীনে। জাতীয় কংগ্রেস ও শাসক বৃটিশের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়ে মহীরুহ ধারণ করে। গত শতাব্দীর ৪৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে যেন 'বোতলবন্দী দৈত্য' বেরিয়ে পড়ল ১৬ই অগাষ্টের Direct Action Day-তে কলকাতায় বাঙালী হিন্দু নিধন যজ্ঞের মধ্য দিয়ে। ঐ পশ্চিমী সংস্কৃতির একটা একান্ত আশ্রয়স্থল 'পাকিস্তান'-এর জন্য। কিন্তু তাতে সাধ না মেটায় বাংলার পূর্ব খণ্ডে অর্থাৎ যেখানে মুজিব হত্যাকারীরা আজ সাজা পায়, সেখানে সংখ্যালঘু বাঙালী হিন্দুর (১৮ক্ষ মাত্র) বর্ধিষ্ণু এলাকা নোয়াখালিকে বেছে নেওয়া হয়। ১৯৭৫ এর ১৫ই অগাষ্টের মুজিব পরিবারের মতো করপাড়ার 'রায়সাহেব' নোয়াখালির হিন্দু মহাসভার সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী'র বাড়ি 'জমিদারী প্রাসাদ' (অধ্যাঃ তপন রায়চৌধুরী ঃ বাঙালনামা) ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬ সাল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজার দিন। সেদিনের লড়াইটাও ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি বনাম পশ্চিমী (আরব) সংস্কৃতি। ঐ দিনের আক্রমণ প্রতিহত করা হলেও পরের দিন চতুর্থ বারের প্রচেষ্টায় নর কাপালিকরা সফল হয়। 'রায়সাহেব' রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীসহ পরিবারের ২২ জনকে সেদিন নিহত হতে হয় সেই পশ্চিমী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের হাতে। রায়সাহেবের কাটা মাথা রূপার থালায় সাজিয়ে উপঢৌকন পায় নরহত্যার মূল পাণ্ডা গোলাম সরোয়ার। সেই ছিন্নভিন্ন ২২টি মৃতদেহ অবশেষে প্রায় তিনমাস পর গান্ধীজীর পৌরোহিত্যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সৎকার হয়। (নোয়াখালীর গান্ধীজী-মনোরঞ্জন চৌধুরী)। সেই থেকে ঐ বিদেহী আত্মাদের পরিজন বিচারের বাণীর জন্য নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। নরহত্যার মূল পাণ্ডা গোলাম সরোয়ার পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় স্থানলাভ করে পুরস্কৃত হয়েছিল। যাহোক, মুজিব পরিবারের ২২ জন হত্যার ২৯ বৎসর পূর্বে ঘটে যাওয়া 'রায়সাহেব' রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী (নোয়াখালির করপাড়ায়) পরিবারের ২২ জন হত্যার স্মৃতি মনে জাগায় না? কিন্তু বীভৎসতা এই—রায়সাহেবের পরিবারের মহিলাদের সকরুণ অবস্থা ও বিচারের বাণী নীরবে, নিভৃতে কাঁদে। মুজিব হত্যায় যে অশুভ পশ্চিমী শক্তি সক্রিয় ছিল, সেই শক্তিই অর্থাৎ ভারত বিভাজনে সক্রিয় পশ্চিমী শক্তিই নোয়াখালির 'রায়সাহেব' রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর পরিবারের গণহত্যায় সামিল ছিল বলা যায়। শুধু তফাৎ এই দীর্ঘ ৩৪ বৎসর পর হলেও মুজিব হত্যার অপরাধীর শাস্তি হয়; আর হয় না বিভাজনের খেলায় মাতোয়ারা পশ্চিমী সাংস্কৃতিক শক্তির কাছে ছিন্ন মস্তক রায়সাহেবের পরিবারের ঘাতক অপরাধীদের। হায়! বিচারের বাণী নীরবে, নিভৃতে কাঁদে, আজও। ঐ পরিবারের একজন হয়ে সেই ব্যথা আজও বুকে বিঁধে।

শিবাশীষ রায়চৌধুরী, দেশবন্ধু নগর, ধুবুলিয়া, নদীয়া

বিভাজনের রাজনীতি

দিলীপ কুমার বিশ্বাস

'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' ছিল ইংরেজের নীতি। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। মুসলমান নেতারা কংগ্রেসে যোগদানে বিরোধিতা করলেন। লর্ড মিন্টো দেখলেন সুবর্ণ সুযোগ, তিনি মুসলমান নেতাদের নিয়ে বৈঠক করলেন সিমলায়। মুসলমান নেতারা উৎসাহিত হলেন এবং মুসলিম লীগ গঠনের সূত্রপাত। ভারত বিভাজনের বীজ বপন হল এই সময়েই। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ আগা খানকে স্থায়ী প্রেসিডেন্ট করে ঢাকাতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হল। ঐ দিনই লাল ইস্তাহার প্রকাশিত হলো ও হাজার হাজার কপি বিলি করা হলো। লাল ইস্তাহারের উত্তেজক সাম্প্রদায়িক বিবৃতির ফলে যে দাঙ্গার সূত্রপাত তা পরবর্তীকালে ভয়াবহ থেকে অতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল।

ঢাকার নবাব সালিমুল্লা, নোয়াখালির গোলাম সারোয়ার, কলকাতার সুরাবর্দিরা হাজার হাজার মানুষের খুনের জন্য শুধু নয়, কয়েক হাজার নারীকে ধর্ষণ করার জন্যও দায়ী।

আর এইসব ঘৃণ্য লোকদের কার্যকলাপ আরও উৎসাহিত হয়েছিল যখন কম্যুনিস্টরা মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তান দাবী করেছিল। এছাড়াও ছিলেন যোগেন মন্ডল যাঁর রাজনীতির মূলে ছিল বর্ণহিন্দু বিদ্বেষ। তিনি সুরাবর্দীর সঙ্গে হাত মেলালেন। তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বোঝালেন মুসলমানরা আমাদের রক্ষা করবে, অতএব মুসলীম লীগকে ভোট দাও। বাবাসাহেব আম্বেদকর সতর্ক করলেন মুসলমানরা অমুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কখনও স্বীকার করে না। তিনি ভবিষ্যৎ ভয়াবহতার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতি-পাগল যোগেন মন্ডল ও জ্যোতি বসুরা তখন পাকিস্তানের জন্য যতদূর পারা যায় তা করলেন।

কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের মুসলিম লীগকে ভোট দিতে বলল। ময়দানের সমাবেশে সুরাবর্দী স্তুনজন্দ্বস্তুব্ধত্রস্তুব্ধনক্সং ঘোষণা করেছিলেন যার ফলে কলকাতায় ১০ হাজারের বেশী লোক খুন হয়েছিলেন ও ২০ হাজার লোক কানা খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি ও জ্যোতি বসুর উপস্থিতি আমাদের আজও মনে করিয়ে দেয় হিন্দু আর মুসলমানের ভেতরে বিভাজনের রাজনীতি করে এই উপমহাদেশের কত বড় সর্বনাশ করেছিলেন তাঁরা।

যোগেন মন্ডল মন্ত্রীত্বের দিকে হাত বাড়ালেন আর তার জন্য তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভাজনরেখা টেনে এক বিরাট সংখ্যক হিন্দু ভোট পাকিস্তানের সপক্ষে মুসলিম লীগের হাতে উপঢৌকন দেওয়ার। যদিও মাত্র কবছরের মধ্যে প্রমাণ হল বাবা সাহেব আম্বেদকরের সতর্কীকরণ সঠিক ছিল।

আর কংগ্রেস? কংগ্রেসের তোষামোদিতে ও বৃটিশ রাজশক্তির সহায়তায় মুসলিম লীগের দাবীর বহর শুধু বাড়তেই থাকল। কংগ্রেসের হম্বিতম্বি যে কতটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তা প্রমাণিত হল যখন ১৯৪৭ সালের ২রা জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দেশ ভাগের পরিকল্পনা মেনে নিল।

বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন দেশ ভাগ যদি হয় তবে জনবিনিময় হবে তার স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমরা কি দেখলাম? দেখলাম পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে আমরা হিন্দুস্থানে উদ্বাস্তু হলাম। জনবিনিময়ের কথা শ্যামাপ্রসাদ ও লিয়াকৎ আলি বলেছিলেন, কিন্তু জওহরলাল মানলেন না। বুদ্ধিমান লোক; তিনি

জনমত

বুঝেছিলেন গণতন্ত্রে ভোট ছাড়া ক্ষমতায় থাকা যায় না, আর হিন্দু ভোট বড় চঞ্চল ও বিভক্ত। তাই তিনি দেশভাগজনিত কারণে ভীত ত্রস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার তাগিদে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ (সম্প্রদায় নিরপেক্ষ?) বলে ঘোষণা করলেন।

দেশ ভাগ হল মাথা গুণে, মুসলমানরা ও যোগেন মন্ডলের অনুগামীরা পেলেন পাকিস্তান অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ওদের সব জমি জিরেত হলো পাকিস্তান আর বাদবাকিদের জন্য থাকল খন্ডিত ভারত। এখন যুক্তির খাতিরে একথা পরিষ্কার যে পাকিস্তানে হিন্দুদের জমি-জমা থাকার কথা নয়, কেননা ভারতে তাদের জন্য তো জমি ভাগ করেই নেওয়া হয়েছে। ঠিক উল্টোভাবে মুসলমানদের ও যোগেনবাবুদের অনুগামীদের জমিজমাও ভাগ করেই দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা পাকিস্তানে এই যুক্তিতে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিতে শুরু করে। অবশ্য হিন্দু বলতে তখন বর্ণহিন্দু ও যোগেন মন্ডলের অনুগামী হিন্দুরা মুসলমানদের চোখে এক হয়ে গেছে।

উত্তর পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোতে পাকিস্তান থেকে দেশ বিভাগের ফলে যাঁরা চলে এলেন তাঁরা ওপারে ফেলে আসা জমি ও সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ বুঝে নিলেন আর ভিটে ছাড়া জমিহারারা আজও হাহুতাশ করছেন। নিয়ম কানুন কি এদেশে এক হতে নেই?

দেশের বিভাজন হল মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদের রাজ-আসনে বসার তাগিদে। দেশকে ঘোষণা করা হল ধর্ম নিরপেক্ষ বলে। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাজনৈতিক গুরু মশাইরা কিছু বোঝেন কিনা তাতে সংশয় আছে। যাহোক, secular বলতে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ধরে নেওয়া যায় তাহলে বলতে হবে এদেশ আদৌ secular নয়। এদেশের আইনতো সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে বিভাজনের আইন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এক আইন আর শিখ, খৃষ্টান ও হিন্দুদের জন্য অন্য আইন। উদাহরণ হিসাবে একজন মুসলমান বিচারক যাঁর চারটি বিবি ঘরে আছেন (এবং আইনে তা বৈধ) তিনি একজন হিন্দুকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করার অপরাধে ৪০,০০০ টাকা জরিমানা ও ৮ বছরের জেল দিতে পারেন। এটাই এদেশের অদ্ভুতুড়ে আইন যা কোনও সভ্য মানুষ কল্পনাও করতে পারেন না।

হিন্দু সমাজের মধ্যেও আজ অতি সুকৌশলে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। প্রায় ছয়দশক ধরে কংগ্রেস ও তিন দশকের বেশী সময় ধরে সি.পি.এম. দাপটে রাজত্ব করল অথচ আজও দেশের কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষর, বিশেষ করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের আজও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে, কেন? কোন অপরাধে? অথচ অনুন্নত সম্প্রদায় থেকে যাঁরা শিক্ষায় ও সম্পদে অগ্রসর তাঁদের তুষ্টির জন্য সংরক্ষণ করার অর্থ অনুন্নত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখা নয়? লালু যাদব, রামবিলাসরা পুরুষানুক্রমে সংরক্ষণ পাবেন কিন্তু হতভাগ্য হতদরিদ্র শবর, কুর্মি ও অন্যান্য জনজাতিও নিম্নশ্রেণীর মানুষজন যে তিমিরে সেই তিমিরে! ওঁরা আজও জানেন না সংরক্ষণ কি ও কেন? ওঁদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছাল না আজও। অন্নহীন, শিক্ষাহীন এই মানুষদের সীমাহীন অজ্ঞতাকে সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছে দেশের সরকার ও অনুন্নত মানুষদের নেতারা। মায়াবতী, লালুপ্রসাদ ও রামবিলাসদের উত্থান দরিদ্র, অনাহারী ও অশিক্ষিত কুর্মি, চামার, যাদবদেরকে কিছুটা খুশী অবশ্যই করে কিন্তু ঐ সব হতভাগ্যদের চিরাচরিত অবস্থার উন্নয়ন হয় না। শিক্ষাহীনতা এদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা যোগায় না। অভাব এদের অন্ন যোগায় না। অনাহার, অপুষ্টি এদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় জীবন বিনাশী ক্ষয় রোগ। পরিণতিতে মৃত্যুই ওদের বাঁচিয়ে দেয়। আর হিন্দু সমাজ বর্ণহিন্দু ও তপশীলী হিন্দুতে দু'ভাগ হয়ে যায়।

পরম্পরা

ফ্রান্সে 'কল্পতরু উৎসব'

"তোমাদের চৈতন্য হোক"

ইলা বসু

যদিও প্রায় এক যুগ আগেকার কথা, তবু পাঠকদের ভাল লাগবে ভেবে লিখছি। 'কল্পতরু উৎসব' পালনের উদ্দেশ্যে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ আমরা লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দর ছেড়ে ফ্রান্সের গ্রেৎজ রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের দিকে রওনা দিলাম। সকলেই জানেন 'কল্পতরু উৎসব' বিখ্যাত, কারণ কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' (ইচ্ছাপূরণ তরু) হয়েছিলেন এবং তাঁর চারদিকে উপস্থিত প্রত্যেককে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের চৈতন্য হোক।" সেই সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরা পূজার্চনার মাধ্যমে এই দিনটিতে 'কল্পতরু উৎসব' পালন করেন।

গ্রেৎজ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বীতমোহানন্দজী ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মে লণ্ডনের বোর্ণ এণ্ড কেন্দ্রে নিভৃত উপাসনার জন্য এসেছিলেন। তখন তিনি গ্রেৎজ কেন্দ্রে 'কল্পতরু উৎসব' পালনের কথা আমাদের জানিয়েছিলেন। তাই আমরা গ্রেৎজ-এ যাওয়ার মনস্থ করি। আমরা দলে পাঁচজন ছিলাম।

স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী (অধুনা প্রয়াত) আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করে আমরা যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ অনুভব করলাম। স্বামী দেবাত্মানন্দজীর নেতৃত্বে দেবগৃহ পূর্ণ করে ভক্তরা সুমিষ্ট সুরে গাইছে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ'। বেদির ওপর সুসজ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণের পট। তিনি পদ্মের ওপর বসে আছেন, ঠোঁটে সুমধুর হাসি, গায়ে শাল—যেন একেবারে জীবন্ত প্রাণোচ্ছল! তাঁকে প্রণাম করে প্রার্থনায় সামিল হলাম আমরা। আনন্দে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পর নৈশ আহারের ডাক এল। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী যত্নসহকারে আমাদের খাওয়ালেন। স্বামী বীতমোহানন্দজী রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে সকালে আবার যোগ দিতে বললেন। তিনি জানালেন, ২৪ ঘণ্টা অখণ্ড 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' সঙ্কীর্তন শুরু হয়েছে রাত্রি ৯টায়, চলবে আগামী কাল রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। প্রধান ফটক সারারাত্রি খোলা থাকবে। যে কেউ যে কোনও সময় প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। 'শুভরাত্রি' জানিয়ে আমরা ঘরে চলে গেলাম। আনন্দে আমার ঘুমই আসছিল না।

উপাসনাকক্ষ আমাকে টানছে। 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' ধ্বনির অনুরণন আমার কানে। উঠে পড়লাম, দ্রুত পায়ে চলে গেলাম মন্দিরে, পরম আনন্দে গলা মেলালাম সঙ্কীর্তনে। ঘণ্টা দুই পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্দির থেকে ফিরে এলাম। আবার ভোর ৫টার আগেই ঘুম থেকে উঠে দৌড়ালাম মন্দিরে।

ভোরবেলা মন্দিরে অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। স্বামী বীতমোহানন্দজী সঙ্কীর্তন পরিচালনা করছেন। সঙ্গতে তানপুরা, বেহালা ও হারমোনিয়াম। আমিও যোগ দিলাম। প্রতি ঘণ্টায় নতুন নতুন ব্যক্তি নামগান পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেজন্য নতুন নতুন আঙ্গিকে সুরমূর্চ্ছনার সৃষ্টি হচ্ছিল। 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' এরকম বিভিন্ন সুরে যে গাওয়া যেতে পারে তা আমি আগে জানতাম না। সন্ধ্যার সময় প্রায় ১০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। দু'জন আফ্রিকান এবং আমরা পাঁচজন ভারতীয় ছাড়া বাকি সকলেই ইউরোপীয়। রাত্রি ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত স্বামী বীতমোহানন্দজী স্বয়ং সঙ্কীর্তন পরিচালনা করলেন। ২৪ ঘণ্টা অখণ্ড নামগানের পর আমাদের হৃদয় আনন্দপূর্ণ। মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হওয়ার পর যেন একটা শূন্যতা অনুভূত হলো! মহারাজ রাত্রি ৯টায় পূজা শুরু করলেন, চলল ২ ঘণ্টা। মহারাজের সুরে সুর মিলিয়ে সকল ভক্ত ১০৮ বার গায়ত্রীমন্ত্র মধুর স্বরে আবৃত্তি করল—'ভূর্ভুবঃ স্বঃ...'।

১ জানুয়ারি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব-এর 'কল্পতরু' হওয়া উপলক্ষে

ইউরোপীয় ভক্তদের কণ্ঠে পবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ আমাকে মুগ্ধ করল। তারপর ১০৮ বার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো। পূজা অন্তে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। ফরাসি ভক্ত জিয়ান কমণ্ডলু থেকে হাতে গঙ্গাজল দিচ্ছিলেন, আর মহারাজ দিচ্ছিলেন অঞ্জলির ফুল।

বাড়ির পিছনদিকের বাগানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হলো। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান, কারণ এই সুন্দর সন্ধ্যায় ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি বা তুষারপাত হয়নি। চারদিকে ইঁট দিয়ে তৈরি একটা বর্গাকৃতি জায়গার মাঝখানে বালি দিয়ে তৈরি হয়েছে হোমকুণ্ড। স্বামী দেবাত্মানন্দজী দু'দিকে প্রচুর কাঠের টুকরো জড় করে বহ্ন্যুৎসবের মতো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, যাতে সবাই ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচে। স্বামী বীতমোহানন্দজী রাত্রি সাড়ে ১১টায় হোম আরম্ভ করলেন। ভক্তরা সব ঘিরে বসল। মহারাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ...'। পরিষ্কার চাঁদ আর তাকে ঘিরে চারপাশে ভাসছে ছোট ছোট মেঘ। মহারাজ যখন ঘি ও নারকেল নাড়ু হোমে আহুতি দিচ্ছেন, তখন আমরাও মহারাজের সঙ্গে সমস্বরে ১০৮ বার উচ্চারণ করলাম 'ওঁ ঐ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা'। পূজা চলাকালীন বহ্ন্যুৎসবের অগ্নিশিখা আমাদের উষ্ণ রেখেছিল। হোম শেষ হলে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম, মহারাজ আমাদের প্রত্যেকের কপালে তিলক পরিয়ে দিলেন।

এবার আমরা সবাই বাড়ির ভিতরে এসে সাধুদের প্রণাম এবং পরস্পরের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। কারণ, ততক্ষণে পুরনো বছর শেষ হয়ে শুরু হয়েছে নতুন বছর ১৯৯৯ সাল। খাবারঘরে গরম চা, কফি, চকোলেট, কেক, বিস্কুট, মিষ্টি ইত্যাদি ছিল। এরকম সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিবেশে নববর্ষ উদ্‌যাপন আগে কখনও দেখিনি বা অভিজ্ঞতাও হয়নি। আমরা সকলে তখন আনন্দে ভাসছি। রাত্রি দেড়টায় পরিতৃপ্ত হৃদয়ে ঘুমাতে গেলাম। উঠতে দেরি হয়ে গেল বলে ভোরের উপাসনায় যোগ দিতে পারিনি। প্রাতঃরাশ সারতে এসে পুনরায় পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালাম। এই সুযোগে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি, এখানে চা বা কফি কাপে নয়, বাটিতে করে পান করা হয়।

স্বামী বীতমোহানন্দজী সকাল ১০টায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করলেন। সাধারণ উৎসবে যোগ দিতে আজ আরও ভক্ত এসেছেন। মন্দিরেই প্রায় ১৫০ জন ভক্ত রয়েছেন। পূজার সময় আমরা ১০৮ বার করে গায়ত্রীমন্ত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্র উচ্চারণের পর অঞ্জলি দিলাম। এরপর ১২টায় মধ্যাহ্নভোজন। গ্রেৎজ কেন্দ্রের বিশেষত্ব হলো ত্রিস্তর মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশাহার।

দুপুর আড়াইটের সময় বক্তৃতাকক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাধারণ উৎসব শুরু হলো। স্বামী সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর ফরাসি অনুবাদ থেকে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারির ঘটনা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। ফরাসি ভাষায় পাঠ, সেজন্য একবর্ণও আমরা বুঝতে পারিনি। এরপর ভক্তিগীতি পরিবেশিত হলো।

এইভাবে ভারতের বাইরে সুদূর পশ্চিমে এই কেন্দ্রে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে 'কল্পতরু উৎসব' পালিত হলো। আমার মনে হলো, সকলকে গ্রেৎজ কেন্দ্রের 'কল্পতরু উৎসব'-এর কথা জানাই। এই চমৎকার উৎসবে টেনে আনার জন্য ঠাকুরকে শতকোটি প্রণাম। এই সুখস্মৃতি বাকি জীবন আমি বয়ে বেড়াব। রাত্রে আহারের পর বন্ধু রসনা বলছিল— "যা অর্চনা করেছি সারাজীবনেও তা করিনি।" আমরা দারুণ খুশি। এখানে আসা সার্থক হয়েছে আমাদের। এ-আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু একান্তে অনুভব করা যায়।

সৌজন্যে ঃ উদ্বোধন

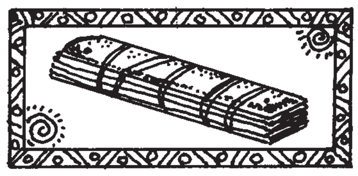

সনাতনী শিক্ষা

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পরিবেশ চেতনা

রবীন সেনগুপ্ত

যে কোনও ভৌত পদার্থই জল থেকে উৎপন্ন হয়। সকল পদার্থই কম-বেশী জল দ্বারা গঠিত। সৃষ্টিকার্য জলেই শুরু হয়। তাই জলের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ, থুতু ফেলা, উলঙ্গ হয়ে স্নান করা, মৈথুন করা উচিত নয়।

২৮ অধ্যায়, শ্লোক ২২, ২৪

মূল সংস্কৃত শ্লোক ঃ তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ। যস্মদ্‌ভবন্তি ভূতানি তাভ্যস্তা ভাবয়ন্তি চ, তস্মান্মুত্রং পুরাষঞ্চ নাপ্সু কুর্ব্বতে সর্ব্বদা, ন স্নায়েদপ্সু নগ্নশ্চ ন নিষ্ঠীবেৎ কদাচন।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ সকল পদার্থেই কমবেশি জল আছে—এটা হলো পদার্থবিদ্যা-রসায়ণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। আর সৃষ্টিকার্য জলে শুরু হয়—এ হলো প্রাণী বিজ্ঞান ও বিবর্তন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। জলে মলমূত্র ত্যাগ, থুতু ফেলা নিষিদ্ধ—এ হলো পরিবেশ চেতনা। দুটি মাত্র শ্লোকের মধ্যে একাধিক বিজ্ঞানের শিক্ষা—এ বোধহয় সংস্কৃত সাহিত্যেই সম্ভব। বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কাউকে উলঙ্গ হয়ে জলে নামতে হয়, তবে সাধারণ ভাবে উলঙ্গ হয়ে জলে নামা সনাতন শিক্ষা বহির্ভূত। বস্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের সখীরা নগ্ন হয়ে জলে নেমেছিলেন বটে। কিন্তু সে ছিল লীলাবিলাস। ভারতীয় শিক্ষায় জলাশয় খনন, জলাশয়কে পরিচ্ছন্ন রাখা এগুলির ভীষণ গুরুত্ব ছিল। পানীয় জলের অনেকটাই তখন নদী ও পুষ্করিণী থেকে নেওয়া হত। ফলে পানীয় জল নিয়ে এত চিন্তা তখন ছিল না। বর্তমানে নদী পুষ্করিণী ইত্যাদির জলকে আমরা দূষিত করে ফেলেছি। তাই দামী ফিল্টার, আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ, সিল করা বোতলের দাম দিয়ে কেনা জল পান করে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য প্রাচীন শিক্ষাগুলিকে আমরা মূল্য দিতে পারিনি যথেষ্ট পরিমাণে।

ফিরে দেখা

বৎসরান্তে উজ্জ্বলতমা অঙ্গনা-রা

॥ ইন্দিরা রায় ॥

সময়ের স্রোতে দীর্ঘ একটা বছর কেটে গেল, অর্থাৎ ২০০৯-এর অবসান হলো। সামনে আসছে নতুন বছর ২০১০। একটা বছর পেরিয়ে আসা মানেই বারোটা মাস। তখনই আমাদের মন চলে যায় ফেলে আসা অতীত দিনগুলোর দিকে। দেখতে চাই 'অঙ্গনার' পক্ষ থেকে মেয়েদের কৃতিত্ব কি ঘটল, মহিলাদের নিয়ে কী কী ধরনের উল্লেখযোগ্য কাজ হল। হ্যাঁ, সেদিক থেকে এক বছরে 'অঙ্গনা'র পাতা সফল। কারণ এই এক বছরে মেয়েদের যেসব কৃতিত্বের কথা, বিশেষত বাংলায়, যতটা সম্ভব আমরা তুলে ধরেছি 'অঙ্গনা'র পাতায়। আপনারা যারা নিয়মিত পাঠক, নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন। কিন্তু দেশে-বিদেশে অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে আছে মহিলাদের নানান কৃতিত্বের। তা তো সব সময়ে 'অঙ্গনা'র পাতায় তুলে ধরা সম্ভব হয়নি বা হয়ও না। বছরের শেষে তাই আমরা দেখে নেব এমনই কিছু মেয়েদের বিরল ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে ।পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যেসব দৃষ্টান্ত হবে অনুপ্রেরণা স্বরূপ। এক ঝলক দেখা যাক সে সব কিছু ঘটনা।

নোবেল পেলেন চাষী পরিবারের কন্যা

এ বছরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

জিতে নিলেন জার্মান ঔপন্যাসিক ও কবি হের্টা মুয়েলার। তাঁর সাহিত্য চর্চা যে খুব স্বচ্ছল পরিবেশে সম্ভব হয়েছে তা নয়। ছোট থেকে তাঁকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছে। রোমানিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক চাষী পরিবারে। এই পরিবেশ থেকে এক সাহিত্যিকের উঠে আসা এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। চেসেস্কু জমানায় যে সব অন্যায় অবিচার ঘটেছিল, সেইসব ঘটনাই তাঁর লেখনীর প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি একাধারে কবি। তাই তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে নির্বাসিতের যন্ত্রণার ছবি।

ম্যানবুকার জয়ী বৃটিশ মহিলা

শুধুমাত্র সাহিত্যে নোবেলজয়ী মহিলা নন, এ বছরে ম্যানবুকার পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন বৃটিশ মহিলা ঔপন্যাসিক হিলারি ম্যান্টেল। তাঁর উপন্যাসটির শিরোনাম— 'উলফ্ হল'। এই উপন্যাসের বিষয় বৃটিশ সমাজের প্রতিচ্ছবি। ষোল শতকে টিউডর জমানার পটভূমিতে টমাস ক্রমওয়েলের উত্থান নিয়ে জমজমাট বিষয়। তাঁর অর্জিত পুরস্কার মূল্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড টাকা। তিনি পুরস্কার নিতে উঠে অগণিত দর্শকের কাছে বলেছিলেন যে, এই উপন্যাসটি লেখবার ব্যাপারে মতামত গ্রহণ করতে তাঁর কুড়ি বছর সময় লেগেছিল। তাঁর অধ্যবসায় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁকে যথার্থ মর্যাদার আসনে স্থান দিল।

শিক্ষক দিবসে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তা ডঃ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

শিক্ষকতার কাজই হল, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা দান। শিক্ষা মানেই শুধু পুঁথিগত শিক্ষার জ্ঞান দান করা নয়, শিক্ষা মানেই তাদের কাজের, সামাজিক কর্তব্যের এবং মনুষ্যত্বের শিক্ষা দান করা। তবেই তিনি যথার্থ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন। এমনই এক প্রকৃত শিক্ষিকা তাঁর মহৎ কাজের জন্য এই বছর 'জাতীয় শিক্ষক'-এর মর্যাদা লাভ করলেন পুরস্কার স্বরূপ। যাদবপুর সম্মিলনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ডঃ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী। এই শিক্ষিকা ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি 'প্রকৃত মানুষ' হয়ে ওঠার শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই তা করে দেখান। তাই, তিনি ছাত্রীদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যাদবপুর সম্মিলনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা পদে আসার আগে উনি আরও দুটি বিদ্যালয়ে, বারুইপুরের রাসমণি বালিকা বিদ্যালয় ও কমলা নারী শিক্ষাসদনে শিক্ষকতা করেছেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি আদর্শ শিক্ষিকা হিসেবেই কাজ করেছেন। বিদ্যালয়ের বাঁধা সময়ের বাইরে তিনি অন্যান্য সংস্থায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সময় দিয়ে থাকেন। তাঁর এই আদর্শগত কাজকর্মের জন্যই আজ প্রকৃত মূল্য অর্জন করলেন। পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে লাভ করেই সেই টাকা মহৎ কাজে ব্যয় করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মল্লিকপুরে, ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশন-এ ব্রেইল ছাপাখানা চালাতে দান করেন। তাঁর এই উদার নীতি ছাত্রীদের নীতিগত শিক্ষালাভে সাহায্য করল।

ফৌজে যেতে চান সাহসিনী রুকসানা

হয়ত আপনাদের জানা আছে, দুঃসাহসী এক মহিলার জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই এর কথা।

হ্যাঁ, সেই মহিলা হলেন সাহসিনী রুকসানা। কাশ্মীর উপত্যকার রাজৌরিতে একলা ছ'জন লস্কর জঙ্গির সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। শুধু লড়াই করা নয়, লড়াইতে একজনকে খতম করেছিলেন এবং বাকিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন দুঃসাহসিক মহিলার এখন মনে ইচ্ছে জেগেছে ফৌজে যোগ দেওয়ার। পুলিস হবার কোন সাধ নেই। কারণ মহিলা পুলিশ হিসেবে নিরাপত্তা নেই। আর ফৌজে যোগ দেবার কারণ দেশের জন্য লড়াই করতে পারবেন মাত্র বাইশ বছরের যুবতী রুকসানা কাওসার।

বর্ষসেরা শিল্পোদ্যোগী মহিলা

খুবই আনন্দের বিষয়, বিদেশে থেকে এক বাঙালি তনয়া বর্ষসেরা শিল্পোদ্যোগীর খেতাব জয় করে নিলেন। তিনি হলেন পিয়ালি রায়। বার্মিংহামে দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পকলা উন্নয়নের সংস্থা, নাম 'সম্পদ' তারই অধিকর্তা পিয়ালি রায়। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সফল এই মহিলাকে বর্ষসেরা 'শিল্পোদ্যোগী পুরস্কার' দিল

অঙ্গনা

ইনস্টিটিউট অব্ এশিয়ান বিজনেসেস। এ ধরনের ঘটনায় বাঙালি হিসেবে, বিশেষত মহিলা হিসেবে তিনি আমাদের গর্ব।

নাবালিকা কিশোরীর বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

এই ঘটনা খুব নতুন নয়, এর আগে বাঁকুড়ার আদিবাসী কিশোরী বাবা-মার বিয়ের প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। যে খবর অঙ্গনার পাতায় আলোকপাত করা হয়েছিল। আবার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল কলকাতার মেয়ে ইন্দু মল্লিক। সে চেতলা শিক্ষামিত্র স্কুলে ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। বাবা-মা তার বিয়ে ঠিক করায় সে রুখে দাঁড়ায়। শুধু বিয়ের খোঁজ নয়, একেবারে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদী এই কিশোরী একলাই প্রতিবাদ করেনি, স্কুলের শিক্ষিকাদের এবং রাজ্যের শিশুকল্যাণ কমিটির কাছেও এই ঘটনার কথা জানায় এবং সেই সঙ্গে চৌদ্দ বছর বয়সী এই নাবালিকা নিজের মনের ইচ্ছের কথা জানায়। লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে। শিক্ষিকাদের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসে। এমন-কী বাবা-মার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করা হয়। কমিটির কাছে আশ্রয় চায় ইন্দু। বাড়ি সে আর ফিরে যেতে চায় না। এখন এ ব্যাপারটি বিবেচনার বিষয়। সাহসিনী কিশোরী নারী প্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

।। চিত্রকথা ।। মহাবলী ।। ১

দুর্গাপুরে বি বি পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সমাজ সেবা ভারতীর অনুমোদিত দুর্গাপুরের বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে এবছরও বার্ষিক অনুষ্ঠান ফরিদপুর খণ্ডের ইছাপুর গ্রামে হয়ে গেল গত ৮ই নভেম্বর। মূল অনুষ্ঠান সমস্ত সেবা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাম পরিক্রমার মাধ্যমে শুরু হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ধ্রুব চক্রবর্তী, আর এস এসের আসানসোল জেলা কার্যবাহ বিপ্লব রায় এবং সমাজ সেবা ভারতীর প্রান্ত কার্যকর্তা অলোক মুখোপাধ্যায়। মোট ১১টি সেবাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী ও সেবাব্রতীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরে শহীদ দিবস পালন

মেদিনীপুর শহরে এল. আই. সি মোড়ে ‘সমাজ’-এর উদ্যোগে ১০ই নভেম্বর বিকালে নন্দীগ্রামে জমি রক্ষার লড়াইয়ে নিখোঁজ কৃষকদের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে প্রবীণ সদস্য প্রভাকর ঘোষ শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে মাল্যদান করেন। এরপর অরূপ দাশগুপ্ত কৃষকের বীরত্বপূর্ণ জমি রক্ষার লড়াইয়ে শহরের শিক্ষিত মানুষের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং মাওবাদীদের ব্যক্তি হত্যায় অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। সভায় ‘স্থিরচিত্র নন্দীগ্রাম’ কবিতাটি পাঠ করেন ভোলানাথ নন্দী। পরবর্তী বক্তা ছিলেন স্নেহাংশু লোধ, ডঃ সুরেশ দাস, গৌরী সরকার প্রমুখ। এছাড়াও নাগরিক সমাজের সভাপতি হরিপদ মণ্ডল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

করুণাময়ী, সল্ট লেক্ নিবাসী মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুত্র অনীক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিবাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর ক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামীর হাতে মঙ্গলনিধি স্বরূপ ৫০০১ (পাঁচ হাজার এক) টাকা প্রদান করেন। উক্ত অর্থ সমাজ সেবার জন্য সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের কোষাধ্যক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মঙ্গলনিধি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের স্বয়ংসেবক দেবীদাস চৌধুরী গত ৪ ডিসেম্বর তার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে সেবা কাজের জন্য পুত্রবধূর হাত দিয়ে পাঁচ হাজার এক টাকা সংঘের বরিষ্ঠ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত-এর হাতে তুলে দেন। ওই অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ প্রচারক প্রদীপ দে-সহ সঙেঘর জেলাস্তরের আরও কয়েকজন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধের ধাদকিডিহি গ্রামের স্বয়ংসেবক সঞ্জয় মাহাত-র বিবাহ উপলক্ষে তাঁর পিতা চক্রধর মাহাত মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব-উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্র প্রচারক অশোক বেরি, প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল এবং বাঁকুড়া জেলা সহ-সঙঘচালক ডাঃ সুভাষ সরকার।

শোক সংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট খণ্ডের কুরমাইল শাখার স্বয়ংসেবক তরুণ কুমার মাহাতো-র মাতৃদেবী গত ২৪শে নভেম্বর সকাল ১০টায় পরলোক গমন করেছেন। বয়স হয়েছিল সত্তর বছর। তাঁর দুই ছেলে এক মেয়ে সহ নাতি-নাতনি বর্তমান। উল্লেখ্য তরুণ কুমার মাহাতো বর্তমানে কর্মসূত্রে জলপাইগুড়ি থাকেন এবং জলপাইগুড়ি জেলা সহ-কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করছেন।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

সেবা ভারতীর পরিচালনায় গত ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর, বর্ধমান জেলার পানাগড় এবং আসানসোলের নিয়ামতপুরে ২ দিনের অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত শিবির গুলিতে ডাঃ বি. সি. সাহা মোট ৮৯ জন রুগীর ইঞ্জেক্সন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন। কাঁক্সা-বিবেকানন্দ সেবা সমিতির কার্যকর্তাগণ শিবির পরিচালনায় পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর মালদা জেলার গৌড় খণ্ডের লাহেড়ীনাড়া শাখার কার্যবাহ সীতারাম মণ্ডলের পিতা পুলিন মণ্ডল (৭০) গত ৭ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। সঙঘানুরাগী পুলিনবাবুর মৃত্যুতে একজন অভিভাবক হারালেন স্বয়ংসেবকরা।

*   *   *

সঙ্ঘের মালদা জেলার মহেশপুর খণ্ড কার্যবাহ তারিণী রায় (৫৩) গত ২২ নভেম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃতুকালে তিনি এক পুত্র স্ত্রী ও বহু গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের রেখে গেলেন।

*   *   *

চলে গেলেন বর্ধমান নগরের আবাল্য স্বয়ংসেবক মহাদেব বসুর মাতৃদেবী তথা বর্ধমান বিভাগের প্রয়াত সঙঘচালক অনিলবরণ বসুর স্ত্রী ভারতী বসু। গত ৬ ডিসেম্বর তিনি বর্ধমানের বি সি সি ইউ নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। দুই পুত্র দুই কন্যা সহ তাঁর নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

*   *   *

সঙেঘর পূর্ব কলকাতার ভাগ কার্যবাহ গণেশ রাউতের মাতৃদেবী তিলকদেবী রাউত গত ৮ ডিসেম্বর নিজগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে দুই পুত্র, এক কন্যা সহ নাতি-নাতনিদের তিনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

সমাবেশ সমাচার

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির—হনুমন্ত কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ “তুম মম ভরত সম ভাই-ই”—ভগবান রামচন্দ্র এই কথা কয়টি মহাবীর হনুমান সম্বন্ধে বলেছিলেন। একথাতেই প্রকাশ পাচ্ছে—রামচন্দ্র কতটা বনবাসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, একাত্ম ছিলেন। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভূপেন্দ্র ভাই পণ্ড্যার ‘হনুমন্ত কথা’ প্রবচন শুনতে শুনতে একথাটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বর-সাতদিন ধরে রোজ দুপুর আড়াইটে থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত কলকাতার শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি প্রতি বছরের মতো প্রবচন ও সৎসঙ্গের আয়োজন করেছিল। উদ্দেশ্য যজমান ও ভক্তদের দান থেকে সংগৃহীত অর্থে বনবাসী, গিরিবাসী, জনজাতিদের জন্য শিক্ষা, সংস্কার এবং আধ্যাত্মিকতা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

কথাকার ভূপেন্দ্র পণ্ড্যা যেন বলতে চাইলেন, বনবাসী শহরবাসী আমরা সবাই ভারতবাসী। হাম তুম এক রক্ত, ভাই ভাই। অবশ্য শুধু ভাবাবেগমাত্র নয়, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রমাণও দিলেন কথাকার। যজ্ঞলব্ধ যে মিষ্টান্নে অযোধ্যার রাজকুমারদের জন্ম সেই একই মিষ্টান্নের অংশ চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আর চিল মুখ খুলতেই তা পুত্রার্থে তপস্যারতা অঞ্জনীর হাতে পড়ে। আর মহাদেবের বরে রুদ্রাবতার বজ্রাঙ্গ হনুমানের জন্ম। তাইতো বলা হয়েছে—

দুর্গম কাজ জগৎমে যে তে।
সুগম করতি হনুমান তে তে॥

আর হনুমান সুবর্ণকান্তি। সূক্ষ্মরূপ, বিকটরূপ লঙ্কা জ্বলায়া। রামভক্তি ও দেশভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহাবীর। চার রকম পরীক্ষা—নিঘর্ষণ, ছেদন, তাপ, তাড়ন। সোনা যাচাই হয় ঘষে-মেজে, কেটে, আস্তনে জ্বালিয়ে এবং তাড়ন বা পেটাই করে। কথাকারের কথায় হনুমান ছিলেন শ্রীরামের সত্যিকারের সুবর্ণমৃগ। বানরদের শাখায় বিচরণ করার জন্য শাখামৃগও বলা হয়। সারকথা রামচন্দ্রের যা কিছু কর্মকাণ্ড সবই মানুষী লীলার জন্য।

অদ্ভুত সরল ও আধুনিক যুগোপযোগী শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় কথামৃতের স্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হলেন কলকাতাবাসী, যাঁরাই ওই সাতদিনে নেতাজী ইন্ডোর গিয়েছেন। ভিতরে বসার ব্যবস্থা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। এই একবিংশ শতাব্দীতেও যে একজন কথাকার হরি-কথার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে এভাবে শহরের দূর-দূরান্ত থেকে নেতাজী ইন্ডোরমুখী করতে পারেন তা চাক্ষুষ না করলে বিশ্বাস হোত না। যাঁরা এলেন তাঁদের উভয়ত পুণ্যলাভ হলো। শ্রীমুখ নিঃসৃত শাস্ত্রবচন শোনা—যুগপৎ পরমার্থ ও লোকহিতার্থে শিক্ষাবিস্তারের কাজে সমর্পণ করে সমাজসেবার ব্রত পালন করলেন তাঁরা। এই কম্পিউটার ইন্টারনেটের যুগেও মানুষ বোকাবাক্সের থেকে সরাসরি শুনতে বেশি আগ্রহী। ইন্ডোরের দৃশ্য তাই প্রমাণ করে। ব্যবস্থাপকরা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র।

খেলার জগৎ

২০০৯ — সাফল্য আর ব্যর্থতার সালতামামি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নয়া দিল্লীর নেহেরু কাপ, টেস্টে এক নম্বর হওয়া ছাড়া এবছর বড় মুখ করে বলার মতো সাফল্য কোথায় জাতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রে? অবশ্য তারই মধ্যে ভুললে চলবে না, মণিপুরী মহিলা মেরিকমের পরপর চারবার বিশ্বকাপ বক্সিং-এ অবিংসম্বাদী কর্তৃত্ব। পুরুষ বক্সার বিজেন্দার সিংয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ব্রোঞ্জ জয় ও নিজের ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ানের শিরোপা পাওয়াও জাতীয় জীবনে আশাব্যঞ্জক ঘটনা। তবে সামনের বছরের প্রায় শেষপর্বে কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসছে দিল্লীতে। তার আগের বছর যে ধরনের উৎকর্ষতা ও উন্মাদনা দেখা উচিত ছিল, তা অবশ্য হয়নি কোনওভাবে।

আসলে মিডিয়া এদেশের মানুষকে ভুলিয়ে দিচ্ছে ক্রীড়া সংস্কৃতির আসল রূপ। অলিম্পিজিম স্পিরিট, যা ধরে একটা জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র সব দিক থেকে উন্নত হয়। প্রগতি ও উৎকর্ষতার মূল্যায়ন হয়, মানদণ্ড নির্ধারিত হয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক সব ক্ষেত্রে। সেই জীবনদর্শন কবে দেখা যাবে প্রতিটি ভারতবাসীর মননে, চেতনে। আর ঠিক এখানে উঠে আসে মিডিয়ার গুরুত্ব। তারা এখন ঘোরতর পক্ষপাতদুষ্ট ও কায়েমী স্বার্থের রক্ষাকবচ। কমনওয়েলথ গেমস যে অলিম্পিকের 'ড্রেস রিহার্সাল'-এর ব্যাপারটি তাদের না বোঝার কথা নয়। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ৮২-র এশিয়াডের কথা। গেমসের দু'বছর আগে থেকে এশিয়াড নিয়ে যে উদ্দীপনা, আবেগের জোয়ার দেখা গেছিল জাতীয় জনমানসে, তার পাশে কোথায় রাখবেন আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসকে? তখনতো এত মিডিয়ার দাপাদাপি ছিল না। তা সত্ত্বেও দেশের প্রতিটি সংবাদপত্র ও একমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যম দূরদর্শন যে পরিমাণ মাইলেজ দিয়েছিল এশিয়ান গেমসের, অন্তত কয়েকমাস আগে থেকে, তা ওই গেমসকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল, রূপ, রস, বর্ণ, আঙ্গিক সব দিকে। আর তখন গেমস আয়োজনের পিছনে প্রধান চালিকা শক্তি ছিলেন প্রয়াত রাজীব গান্ধী যিনি আদ্যন্ত ক্রীড়ামনস্ক ব্যক্তিত্ত্ব। তার নজরদারি ও তৎপরতা সর্বোপরি ভারতীয় অলিম্পিক সংঘের কর্তা-ব্যক্তিদের সাংগঠনিক দক্ষতার এশিয়াড ৮২-এর বিশ্বমঞ্চে ভারতের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ।

তাই কমনওয়েলথ গেমসের এক বছর আগে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মতোই ভারতবর্ষের ক্রীড়ামানসিকতার কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। নেহেরু কাপ জয়, টেস্টের একনম্বর হওয়ার মধ্যে বিশেষ কোনও গৌরব নেই। নেহেরু কাপে বেছে বেছে সেইসব দলকে আনা হয়েছিল যাদের হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ান হতে পারবে। পর পর তিন বছর দিল্লির মাঠ থেকে তিনটি মাঝারি মানের টুর্নামেন্টে জিতে আহ্লাদিত হবার কোনও কারণ নেই। ভারত কোচ বব্ হাউটন তার নিজের চাকরি ধরে রাখতে ভারতের সমকক্ষ দলের সঙ্গে বছরে একটা টুর্নামেন্ট খেলান ছেলেদের। আর তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে যান স্পেন, পর্তুগালে। সেখানে অবশ্য দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির ক্লাব দলগুলির বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলেন। দেশের মানুষকে আর কতদিন বোকা বানিয়ে রাখবেন বৃটিশ সাহেবেরা? একইভাবে ক্রিকেট টিমের একনম্বর হওয়ার মধ্যে কোনও গরিমা নেই। এদেশে টেস্ট বা একদিনের ম্যাচের সিরিজের কোনো স্বচ্ছতা নেই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের হাতে প্রচুর টাকা। আই সি সি বোর্ডের কথায় ওঠে, বসে। ভারতকে এক নম্বর বানাতে পারলে আরও বেশি স্পনসরড বোর্ডের কোষাগার আরও ফুলে-ফেঁপে ওঠা তিন পুরুষ বসে খেয়ে যেতে পারবে।

ভারতীয় হকি দলের কাছে এ বছরটা খুব খারাপ গেল। কয়েক মাস পরেই হবে বিশ্বকাপ হকি। আশায় বুক বাঁধছে দেশের হকিপ্রেমীরা। ব্যক্তিগত স্তরে দুই বক্সার যাঁদের কথা ভূমিকায় বলা হয়েছে সেই বিজেন্দার ও মেরিকম ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না বছরের সফল ক্রীড়াবিদ হিসাবে।

ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেওয়াল, দাবায় শশীকিরণ, সূর্যশেখর, শুট্যিংয়ে মানবজিৎ সিং, গলফে জীব মিলখা সিং-রা বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝলসে উঠেছেন। এরা অবশ্য প্রত্যেকেই বিশ্ব পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ। তাদের কাছ থেকে আর একটু ধারাবাহিকতা অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল।

শব্দরূপ - ৫৩১

দেবলীনা সেনগুপ্ত

১	■	২		৩	■	৪	■
	■		■	৫			■
৬			■		■		■
	■	■	■	■	৭		৮
৯	১০		■	■	■	■	
■		■	১১	■	১২		
■	১৩			■		■	
■		■	১৪			■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. ঢেউ, শেষ দু'য়ে মহাদেব, ৫. হিন্দু চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ, আগাগোড়া ধবংস, ৬. তৎসম শব্দে কমলালেবু, শেষ দু'য়ে কৌতুক, ৭. প্রতিশব্দে প্রকার, ধরন, রীতি, ৯. এখানে ধনদেবী লক্ষ্মী অন্য নামে, আগাগোড়া কদলী, ১২. আম গাছ, সরস, ১৩. মানুষের মত দেহবিশিষ্ট দেবালোকের গায়ক জাত বিশেষ, ১৪. "—রঙ বসনখানি নেশার মতো বক্ষে ধরে" (রবীন্দ্র) শূন্যস্থানে ফিকে হলুদ রং।

উপর-নীচ ঃ ১. মহাদেব, তিনে-পাঁচে নাসিকা, ২. সুগন্ধ এক মশলা বিশেষ, প্রথম দু'য়ে রামতনয়, ৩. বিশেষণে যে রক্ষা করে, রক্ষাকর্তা, ৪. রণবাদ্যরূপে ব্যবহৃত এক বিরাট বাদ্য, ৮. অন্য নামে দুর্গাদেবী, এক-তিনে নোংরা, ১০. স্বর্গের গঙ্গা, ১১. প্রতিশব্দে উৎসব, ১২. মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশীর কালী পূজা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫২৯

■	ব	শি	তা	■	কু	বে	র
■	জ্র	■	ন্ত্রি	■	টি	■	জ
না	■	■	ক	ম	লা	■	ত
ই	ত	র	তা	■	■	■	জ
ঘ	■	■	■	কা	ল	কে	য়
রে	■	দ	ম	ন	■	■	ন্তী
খাঁ	■	খি	■	কা	■	নো	■
ই	মা	ন	■	টা	কু	য়া	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
শান্তনু গুড়িয়া,
বাগনান, হাওড়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৩১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ জানুয়ারী, ২০১০ সংখ্যায়

মালদায় একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা।। গত ৬ ও ৭ ডিসেম্বর মালদা শহরের ডি. এস. এ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের, উত্তরবঙ্গের একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দেশের অগণিত জনজাতি যুবক যুবতীদের খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ও তাদের প্রকৃতিপ্রদত্ত শারীরিক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে দু'দিনের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা থেকে মোট ১৮৫ জন জনজাতি প্রতিযোগী এই ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে। তীরন্দাজী, খো খো, দীর্ঘ লম্ফন এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, এখান থেকে নির্বাচিত প্রতিযোগীরা আগামী ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ডিসেম্বর হিমাচল প্রদেশের সোলন শহরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

৬ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তীর ছুঁড়ে প্রতিযোগিতা শুরু করান মালদা জেলা শাসক শ্রীধর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, সুভাষ সরকার (সম্পাদক ডি এস এ), ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, সত্যনারায়ণ মজুমদার প্রমুখ। ৭ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার পৌরপিতা নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারী। তিনিই প্রতিযোগীদের পুরস্কার তুলে দেন।

গত এক দশকে দুনিয়া পাল্টে গিয়েছে অনেকটাই

তারক সাহা

নতুন শতকের একটা দশক কেটে গেল। কয়েকদিন বাদে আরেকটা দশক শুরু হচ্ছে। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে পুরানো দশক। সদ্য ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া দশকে কী পেয়েছি, কী হারিয়ে গেছে তারই একটা হিসাব-কিতাব পেশ করা হচ্ছে।

পুরানো দশক শুরু হয়েছিল আশার দশক হিসেবে। কম্প্যুটারের বাড়-বাড়ন্ত দেশজুড়ে। কম্প্যুটার খুলে দিয়েছিল বাণিজ্য জগতে নতুন দিগন্ত। খোলা দুনিয়ায় খোলা বাজারে এদেশে শুরু হয়েছিল 'ই-কমার্স'। y-2k-তে এদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী লগ্নী (FDI) শুরু হয়েছিল কম্প্যুটারের মাধ্যমে।

দশকের শুরুতেই ধাক্কা এসেছিল আমাদেরই দেশে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত সবচেয়ে অগ্রগণ্য রাজ্য গুজরাটে— প্রকৃতির এক বড় ধাক্কা। স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল গুজরাটের ভুজ, কচ্ছ এলাকায়, এদেশের ৫১-তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে। তিরিশ হাজার মানুষ আর দেখতে পেল না সেই বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচ-কাওয়াজ। দুঃসহ-বিভীষিকাময় ২০০১ কাটল দেশের গণতন্ত্রের ওপর বিশাল আক্রমণের মাধ্যমে। পাক ষড়যন্ত্রের শিকার ভারতীয় সংসদ। ৭ জন বীর পুলিশ শহীদের রক্তে রক্ষা পেল দেশের ৫৪৩ জন সাংসদ। আজও সংসদভবনের মাটি শহীদ জওয়ানদের রক্তে রঞ্জিত। সবচেয়ে হতাশার বিষয় হল ওই বিভীষিকাময় দিনের অন্যতম কাণ্ডারী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারল না এদেশের সরকার আজও পর্যন্ত।

ওই বছরে এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়েছিল মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা। দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনের নির্দেশেই নাকি ঘটেছিল ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার আক্রমণ। তিন হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারালো ওই একটি মাত্র ঘটনায়। এর আগে দুনিয়ার কেউই ভাবতে পারেনি দুনিয়ায় সবচেয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেশ আমেরিকার মান-মর্যাদাকে এমনভাবে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারে একদা ওই দেশেরই প্রশ্রয়ে তৈরি এক ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেন। ওসামার সন্ধানে বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানে চালালো সামরিক অভিযান।

এদেশে তৎকালীন এন. ডি. এ. সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সারাদেশকে সড়কে মুড়ে ফেলার যোজনা ঘোষণা করলেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, অসম থেকে গুজরাট—দেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বরাবর স্বর্ণ চতুর্ভুজের যোজনা প্রধানমন্ত্রীর সড়ক যোজনার-ই অন্তর্গত। দেশের জি ডি পি-র উন্নয়ন গড়-পড়তা ৫ থেকে সাড়ে শতাংশ পৌঁছায়। এই স্বর্ণ-চতুর্ভুজের ফসল ঘরে তুলছে মনমোহন-সোনিয়া সরকার।

এরই মধ্যে দেশের মধ্যে ঘটে গেল এক সর্বনাশা কাণ্ড। অযোধ্যা থেকে আমোদাবাদে ফিরে আসছিল করসেবকরা। কে বা কারা গোধরা ষ্টেশনে জ্বালিয়ে দেয় সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ বগি। কত নিরপরাধ মানুষের প্রাণ গেল। বলা যায় দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অটুট বন্ধনে আঘাত হানতে চাইলো কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা। পরবর্তী ঘটনা গুজরাত দাঙ্গা। স্বাধীনতার পর অন্যতম এক ভয়াবহ দাঙ্গা নামে ইতিহাসে ঠাঁই পেল ২০০২-র ফেব্রুয়ারি মাসের ওই কালান্তক ঘটনা। এর ছাই চাপা আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে, যার কাঠকয়লা আজও উত্তপ্ত রাজনীতির অঙ্গন।

দেশের কালো মেঘের আড়ালে সূর্যের ঝলক দেখা দিল। এ পি জে আবদুল কালাম দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান এই ব্যক্তিত্বকে সাংবিধানিক উচ্চতম পদে কিন্তু বসালো বি জে পি। তথাকথিত রাজনৈতিক আঙিনায় বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে আখ্যাত হলেও একজন মুসলিমকে উচ্চতমপদে বসানোর আহ্বান আসে বিজেপির তরফ থেকেই। ২০০২ সালেই মনমোহনের প্রদর্শিত পথেই এন ডি এ সরকার দ্বারা বালকো বিলগ্নীকরণ, বীমাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রবেশাধিকার, এমন সব বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

২০০৩ শুরু হয়েছিল মুম্বাইয়ে জোড়া বিস্ফোরণের মাধ্যমে। পাকিস্তানের জঙ্গিরা বারবার তাদের টার্গেট রয়েছে দেশের বাণিজ্য-নগরীকে। ভারতীয় হিসেবে গর্বিত হলাম যখন পাঞ্জাব দুহিতা কল্পনা চাওলার অন্তরীক্ষে যাত্রা, কিন্তু দুঃখের বিষয় কল্পনা আমাদের সমস্ত আশাকে জল ঢেলে চলে গেলেন ইহলোক ছেড়ে। বুশ প্রশাসন এই সালেই সাদ্দামের সন্ধানে ইরাকে চড়াও হয়ে বিশ্বজুড়ে ধিকৃত হয়। সৌরভ নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট দলের দ্বিতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হবার সুযোগ হাতছাড়া হয় অষ্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়ে।

এরপর ২০০৪। বাজপেয়ী সরকার ইন্ডিয়া সাইনিং-র গ্ল্যামার দিয়ে নির্বাচন জিততে চেয়েছিলেন। খানিকটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জেরেই নভেম্বর থেকে মে মাসে নির্বাচন এগিয়ে এনে ভরাডুবি হলো এন ডি এ সরকারের। ১৯৯৬-এ কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পর খণ্ড ছিন্ন কংগ্রেসে অক্সিজেন জোগালেন সোনিয়া। প্রাদেশিক দলগুলি কংগ্রেসের ছাতার তলায় জড়ো হলো অনেকটা এন ডি এ-র প্রদর্শিত পথেই। লালু, রামবিলাস, মুলায়ম, মায়াবতীর মতো প্রাদেশিক দলগুলির শরণ নিতে হলো শতাব্দী পুরাতন কংগ্রেসকে। সোনিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হল ইউ পি এ জোট। প্রথমে এটাকে নেহাতই জোট ভাবা গেলেও ৫ বছর রাজত্ব চালিয়ে গেল এই জোট। ২০০৪-র ২৫শে ডিসেম্বর সুনামি এসে ভাসিয়ে দিল শত শত সংসার। তাতে সামিল মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা সহ ভারতের মতো উপকূলবর্তী দেশগুলি। ২ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় দুনিয়ার উন্নতশীল ১২টি দেশে। ১৯৯৯-তে কার্গিল যুদ্ধের আগে বাজপেয়ীর বদান্যতায় যে লাহোর বাসযাত্রায় শুরু, নওয়াজ শরিফের পাকিস্তানে তাতে জল ঢেলে দেয় মুশারফ সরকার কার্গিলযুদ্ধ দিয়ে। ২০০৪ সালেই আবার শুরু হয় লাহোর বাসযাত্রা।

এলো ২০০৫। ভারত আবার সৌজন্য দেখালো পাকিস্তানকে। দু'দেশের নাগরিকদের সুবিধার জন্য শ্রীনগর-মুজফ্ফরাবাদ বাস সার্ভিস চালু হলেও পাকিস্তান কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহ্য বহাল রাখলো। পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত

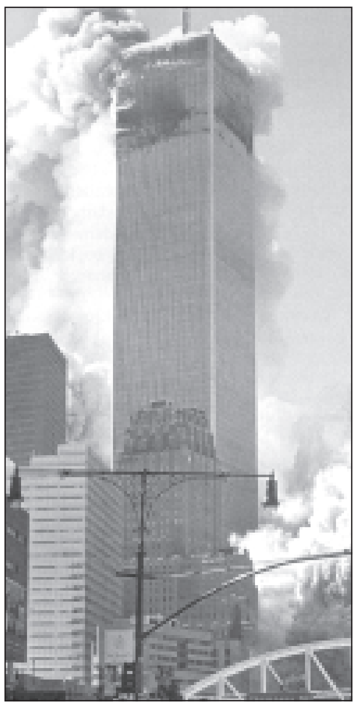

জঙ্গিরা দিল্লিতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৬২ জন নিরপরাধ মানুষেরা প্রাণ নিল। পাকিস্তানে গিয়ে এল কে আদবানি জিন্না সম্পর্কে আলটপকা মন্তব্য করে নিজের দলেই সমালোচিত হন এই ২০০৫-সালেই। ২০০৫ সালের ভয়াবহ বর্ষা মুম্বাই বহুদিন মনে রাখবে। কাশ্মীর উপত্যকায় ৮০ হাজার মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাল ভূ-কম্পনে।

২০০৬ এ রাজ্যে চিহ্নিত থাকবে বার্ড-ফ্লু বর্ষ হিসেবে। বার্ড-ফ্লুর আতঙ্কে দেশজুড়ে মুরগীর মহামারী। ৮০ টাকার মুরগী বিকিয়েছে কুড়ি টাকায়। প্রশাসন লোক লস্কর নিয়ে মুরগী নিধন যজ্ঞে মাতলো বেশ কিছুদিন। ভয় না পেয়ে যারা ওই সময়ে কুড়ি টাকার মুরগী খেয়েছে তারাই শেষমেশ লাভবান।

আবার জঙ্গি নিশানায় মুম্বাই। ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ২০৯ জনের মৃত্যু। সোনিয়ার নির্দেশে সি বি আই কুত্রোচির নামে বোফর্স মামলার সব অভিযোগ তুলে নিল। এই সময়ে বোফর্স মামলা কংগ্রেসের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলস্বরূপ রাজীবের ক্ষমতা থেকে নির্বাসন। সেই মামলার এমন নির্জলা পরিসমাপ্তি ভাবা যায়! কাউকে দোষী প্রমাণিত না করেই!

২০০৬ সালেই মনমোহন সরকার বুশ প্রশাসনের সঙ্গে বাম বিরোধিতা সত্ত্বেও চুক্তি সম্পাদন। ভাগ্যের পরিহাস ২০০৮ সালে এই চুক্তির জন্যই দেশজুড়ে সিপিএমের অবস্থা টালমাটাল।

২০০৭ শুরু হল দুনিয়ার ক্রিকেটে টি-২০ ম্যাচের শুরু দিয়ে। ক্রিকেটে ক্রমশঃ ৫ দিনের টেস্ট ম্যাচ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। ৫০ ওভারের খেলার স্থান নিতে এবার ময়দানে এসে পড়ল ২০-২০ ম্যাচ। প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাৎ ভারতের। প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ভারত। গুর্জর আন্দোলনের শিকার রাজস্থান। বসুন্ধরা রাজের বিজেপি সরকারের বিড়ম্বনা। কল্পনা চাওলার পর অন্তরীক্ষে পদচারণা সুনীতা উইলিয়ামসের। নন্দীগ্রাম দিয়ে শুরু হয়ে গেল সিপিএমের অন্তর্জলি যাত্রা। জবর দখল জমি নিয়ে কেমিক্যাল হাব গঠনের মধ্য দিয়ে সিপিএম তার বন্ধ্যা রাজনীতির দুর্নাম ঘোচাতে চেয়ে বিপদ ডেকে আনলো। মমতা হাতে পেয়ে গেলেন সিপিএমের মারণ অস্ত্র। সিপিএম ক্ষেপিয়ে দিলো মুসলমানদের। দল বেঁধে মুসলমানরা নোঙর ফেললো দিদির ঘাটে। সোনিয়া দেশের দ্বাদশ রাষ্ট্রপতি করার জন্য প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিভা পাটিলকে নির্বাচিত করে ইতিহাস গড়লেন।

২০০৮ আবার বিষাদময়। ২০০১-র পর পাক-জঙ্গিদের আবার ভারতে হানা। আবার টার্গেট সেই মুম্বাই। করাচী থেকে নৌকায় চড়ে কাসভ-আবু ইসমাইলেরা মাত্র দশজন দেশের সুপ্রশিক্ষিত পুলিশবাহিনীকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়ল। লাগাতার ৫৯ ঘণ্টা সম্মুখ সমরে ২০০ জন নিহত, এর মধ্যে পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্তাও রয়েছেন। সিঙ্গুরে টাটারা একলাখি গাড়ীর কারখানা গড়তে চাইলেও বাধ সাধলেন মমতা। অনিচ্ছুক চাষীদের ৪০০ একর জমি ফেরৎ দেবার আন্দোলনে পরাজিত রাজ্য সরকার। পরিণাম টাটারা পাততাড়ি গোটালো। প্রকাশ কারাত সমর্থন তুলে নিলেও মনমোহন সরকার টিকে রইলো মুলায়মের বদান্যতায়। বিশ্বের মন্দার জেরে মুখ থুবড়ে পড়ল সেনসেক্স। সূচক ২১ হাজারের থেকে ধড়াস করে নেমে এলো ১০ হাজারেরও নীচে। বেজিং অলিম্পিকে অভিনব বিন্দ্রার সোনা জয়।

২০০৯ আরম্ভ হয়েছিল ভারতীয় সিনেমায় জয়জয়কার নিয়ে। স্লামডগ মিলিয়োনেয়ারের অস্কার জয়। বারাক ওবামার অভিষেক। কপিল সিব্বালের দশম শ্রেণীর পরীক্ষা তুলে দেবার প্রস্তাব। কোপেনহেগেনে গ্রীন হাউস গ্যাস নিয়ে হৈ চৈ। উন্নত দেশগুলি নিজেদের দেশে কার্বন নির্গমনের মাত্রা হ্রাস না করে উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর চাপ দিচ্ছে কার্বন নির্গমন কম করতে। চীনের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক মতানৈক্য যতই থাকুক এ ব্যাপারে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন একাট্টা। তাই উষ্ণায়ন রুখতে দুনিয়া কী কী ব্যবস্থা নেয় তা নিয়ে তাকিয়ে ছিল বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষ। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হলো।

আর কদিন বাদেই একবিংশ শতকের এক দশক কেটে যাবে। সন্ত্রাসবাদের বাদলে, উষ্ণায়নের বিপদ নিয়ে, আশা-হতাশা নিয়ে এগিয়ে আসবে নতুন দশক। পুরোনো দিন ঠাঁই পায় ইতিহাসের পুঁথিতে। দুনিয়া এগিয়ে চলে। আমরা তাই এগিয়ে যাব অন্ততঃ এটুকু আশা নিয়ে যে, মানুষ বাঁচতে চায় একটু শান্তিতে, সহাবস্থানের মাধ্যমে।

RNI No.5257/57
28 December - 2009, Rs. 4.00 only
27/1B, Bidhan Sarani, Kol.-6, Ph. 2241-0603

Swastika
Bengali News Weekly

Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

2010

১৪১৬ JANUARY পৌষ-মাঘ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31		20th Saraswati puja	23rd Netaji Birthday	26th Republic day	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	একাদশী	12	13	14	অমাবস্যা	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	একাদশী	27	28	29	পূর্ণিমা

১৪১৬ FEBRUARY মাঘ-ফাল্গুন

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	একাদশী	10	11	12	অমাবস্যা
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	একাদশী	26	27
পূর্ণিমা			27th Fateha Doaz Dahum	28th Dol Jatra		

ফাল্গুন-চৈত্র MARCH ১৪১৬

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	একাদশী	12	13
14	অমাবস্যা	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	একাদশী	27
28	29	পূর্ণিমা	31			

১৪১৬-১৭ APRIL চৈত্র-বৈশাখ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1st Yearly Bank A/c	2nd Good Friday	15th Bengali New Years	1	2	3
4	5	6	7	8	9	একাদশী
11	12	13	অমাবস্যা	15	16	17
18	19	20	21	22	23	একাদশী
25	26	27	পূর্ণিমা	29	30	

১৪১৭ MAY বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31			1st May Day		1
2	3	4	5	6	7	8
একাদশী	10	11	12	13	অমাবস্যা	15
16	17	18	19	20	21	22
23	একাদশী	25	26	পূর্ণিমা	28	29

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় JUNE ১৪১৭

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	একাদশী	9	10	11	অমাবস্যা
13	14	15	16	17	18	19
20	21	একাদশী	23	24	25	পূর্ণিমা
27	28	29	30			

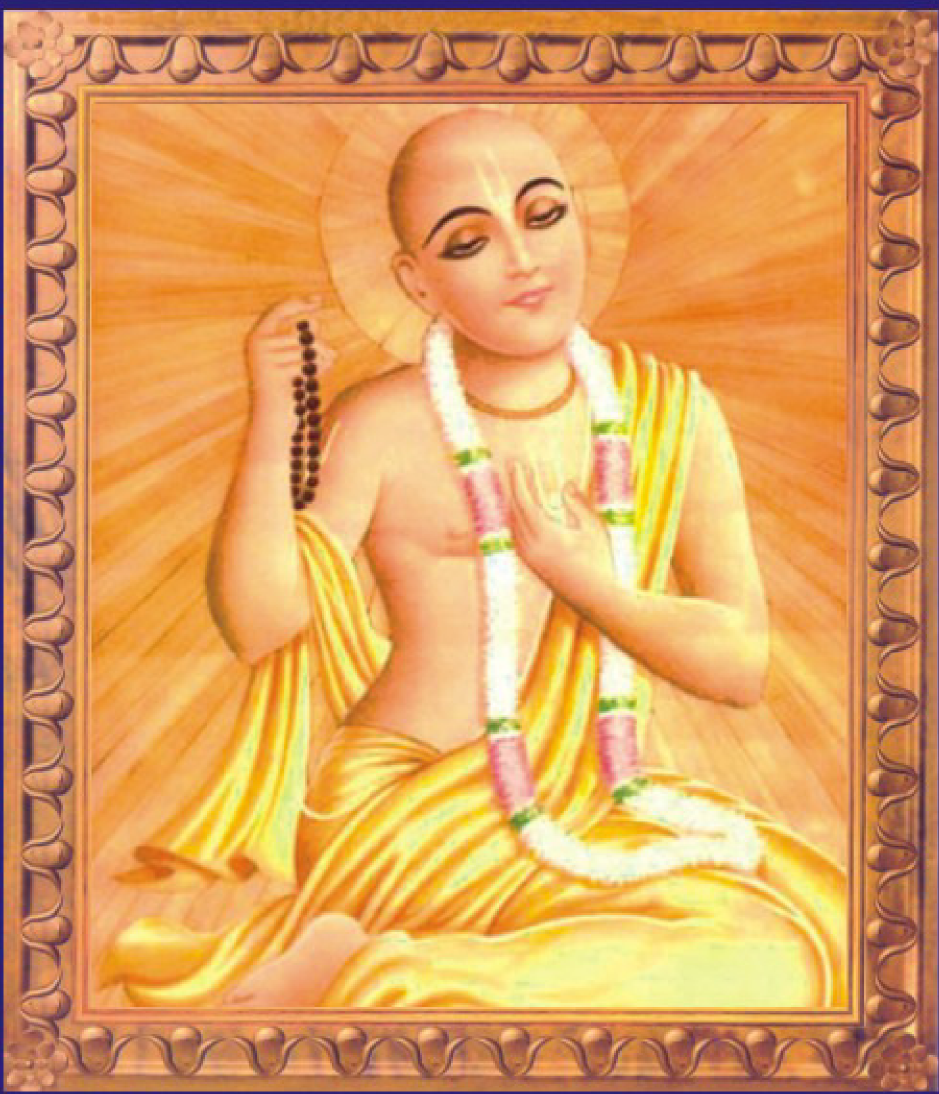

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ৫০০তম বর্ষ

১৪১৭ JULY আষাঢ়-শ্রাবণ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	একাদশী	9	10
অমাবস্যা	12	13	14	15	16	17
18	19	20	একাদশী	22	23	24
পূর্ণিমা	26	27	28	29	30	31

১৪১৭ AUGUST শ্রাবণ-ভাদ্র

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	একাদশী	7
8	9	অমাবস্যা	11	12	13	14
15	16	17	18	19	একাদশী	21
22	23	পূর্ণিমা	25	26	27	28
29	30	31		15th Indepen-dence Day		

ভাদ্র-আশ্বিন SEPTEMBER ১৪১৭

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1st Janmas-tami	11th Id-ul-fiter	1	2	3	একাদশী
5	6	7	অমাবস্যা	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
একাদশী	20	21	22	পূর্ণিমা	24	25
26	27	28	29	30	30th Half Yearly Bank A/c	

১৪১৭ OCTOBER আশ্বিন-কার্তিক

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31	2nd Gandhi Birthday	7th Mahalaya	14th to 17th Durga Puja	22nd Laxmi Puja	1	2
3	একাদশী	5	6	অমাবস্যা	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	একাদশী	19	20	21	22	পূর্ণিমা
24	25	26	27	28	29	30

১৪১৭ NOVEMBER কার্তিক-অগ্রঃ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	একাদশী	3	4	5	অমাবস্যা
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	একাদশী	18	19	20
পূর্ণিমা	22	23	24	25	26	27
28	29	30	5th Kali Puja	17th Id-uz-zoha	21st Guru Nanak Birthday	

অগ্রঃ-পৌষ DECEMBER ১৪১৭

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	17th Muharram	25th Christmas Day	1	একাদশী	3	4
অমাবস্যা	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	একাদশী	18
19	20	পূর্ণিমা	22	23	24	25
26	27	28	29	30	একাদশী	

সৌজন্যে সোমক ব্যানার্জী যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৪১১৬৩৫
যে কোনও LIC পলিসি এবং শেয়ারে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন